মুক্তিসাধনায়

রবীন্দ্রনাথ

॥ ভূমিকা ॥

শ্রীসজনীকান্ত দাস

‘ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত’, ‘ফরাসী বীরাঙ্গনা’,
‘বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ’, ‘শহীদ যুগল’, ‘স্বরাজ সাধনায়
বাঙ্গালী’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

: প্রাপ্তিস্থান :

॥ সেবাব্রতী ॥

১৯।১এ, পঞ্চাননতলা লেন, বহুবাজার

ক লি কা তা - ১ ২

॥ প্রথম প্রকাশ ॥

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী, ১৩৬৮

মূল্য ঃ তিন টাকা মাত্র

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

বাণী নিকেতন
২১৭, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মালবিকা দেবী কর্তৃক ১৭।১এ পঞ্চাননতলা লেন, কলিকাতা-১২
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীহরিপদ পাত্র কর্তৃক সত্যনারায়ণ প্রেস,
২০, গৌরমোহন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের নিবেদন

মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবর্ষ-উৎসব উপলক্ষে ভক্তজনেরা ষোড়শ উপচারে তাঁহার অর্চনা করিয়াছেন। আমিও তাঁহার একজন দীন ভক্ত; উপচার কোথায় পাইব? অন্তরের ভক্তিই আমার প্রধান সম্বল। তাহা দিয়াই পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া কবিগুরুর নীরাজনা করিলাম।

গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস। এজন্য তাঁহাকে সস্নেহ আশীর্বাদ জানাইতেছি। প্রকাশিকা শ্রীযুক্তা মালবিকা দেবী গ্রন্থখানির প্রকাশের ভার লইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

দীন ভক্তের রবীন্দ্র-পূজার এই অর্ঘ্য বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের নিকট সমাদর পাইলে তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক হইবে।

বৈশাখ ১৩৬৮ — শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

ভূমিকা

১৯৪০ সনের এপ্রিল মাসের গোড়ায় দেশের কাজে তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি প্রশ্ন করি। তিনি জবাব দেন। এই প্রশ্নোত্তর একটি প্রবন্ধাকারে প্রথমে ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বিশেষ করিয়া কলিকাতার ইংরেজী বাংলা যাবতীয় সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া রাজনৈতিক মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ তাহাতে বলিয়াছিলেন :

"দেশের জন্যে আমার যত কিছু ভাবনা, সুদূর বাল্যকাল থেকে যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন করেছিল, ছন্দোবদ্ধ রূপেই শুধু তা প্রকাশ পায় নি। আমি বরাবরই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে, এর জন্যে সর্বস্ব পণ করেছিলাম। আমার সর্বস্ব খুব বেশি ছিল না; যতটুকু ছিল, ততটুকুই নিঃশেষে উজাড় করে পরীক্ষার কাজ চালিয়েছি। সমধর্মী ব্যক্তির সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাব হয় নি। ভিক্ষাপাত্র হাতে খালি পায়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে, দেশের লোকের প্রাণে সাড়া জাগাবার জন্যে দিনের পর দিন কত অজ্ঞাত অখ্যাত জায়গায় সভা করে বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছি। এক মুহূর্ত নিশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না। শুধু সভা আর পরামর্শ—পরামর্শ আর কাজ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই ইতিহাস, কেউ লিখে রাখে নি। আজ চেষ্টা করলেও তোমরা সে নষ্ট ইতিহাস উদ্ধার করতে পারবে না;

টুকরো টুকরো খবর পাবে, কিন্তু আমাদের সেই নিরলস সাধনার সম্পূর্ণ ইতিহাস কোন দিনই আর লোকচক্ষুর গোচরে আসবে না।”

ইহা হইল স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকের কথা—১৯০৫ সনের কথা। অর্ধ-শতাব্দীরও উর্ধ্বকাল পরে দেশসেবক শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও গবেষণার দ্বারা সেই নষ্ট ইতিহাস উদ্ধার করিবার যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাই এই রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষ উৎসব উপলক্ষে “মুক্তি-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ” নামে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করিল, ইহা বাঙালী জাতির পক্ষে শুভ-সূচক। এই মূল্যবান গ্রন্থখানি সাধারণের দরবারে উপস্থিত করিয়া দিবার অধিকার দানে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রকুমার গুহরায় আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহার পরিচয় আজ সর্বজনবিদিত। তৎসত্ত্বেও আমি আধুনিক যুগের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তাঁহার সামান্য পরিচয় দিতেছি।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অগ্রগামী সৈনিকদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। নিগ্রহ-নির্যাতনের মধ্য দিয়া তিনি সৈনিকের কর্তব্য পালন করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি রাজনীতিক কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছেন।

মাতৃভূমির সেবার সঙ্গে নগেনবাবু বরাবর মাতৃভাষারও সেবা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট দুইটিই পুণ্যকর্ম। জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হইয়া তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বাংলার প্রধান প্রধান দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলিতে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি ও রাজনীতিক মতামত সম্বন্ধে এই প্রবীণ লেখক পাঁচটি প্রবন্ধের সাহায্যে আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই সুলিখিত, উপাদেয়

ও তথ্যপূর্ণ। এই প্রবন্ধগুলিতে নগেনবাবুর যত্ন পরিশ্রম ও মননশীলতার সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রীতির পরিচয় মিলিবে।

ভাষার উপর অধিকার, ভাব-সম্পদ এবং চিত্তাকর্ষক রচনা-শৈলী—প্রধানত এই তিনটি গুণ থাকিলেই সুলেখক হওয়া যায়। নগেনবাবু এই তিনটি গুণেরই অধিকারী। তাঁহার রচিত "মুক্তি-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ" বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মতো সমাদৃত হইবে বলিয়া আমার নিশ্চিত ধারণা।

বৈশাখ—১৩৬৮ **শ্রীসজনীকান্ত দাস**

॥ সূচী ॥

কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ

(১৮৭৫-৭৬)

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ

(১৮৮৬)

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

(১৯০৬)

॥ প্রাক্-স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ ॥

জাতি-গঠনে রবীন্দ্রনাথের অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি তাঁহার অতুলনীয় রচনাবলীর মাধ্যমে পরাধীন অবস্থায় জাতির প্রাণে জাগাইয়াছেন আশা ও উৎসাহ, জাতীয় জীবনের অন্ধকার দুর্যোগ রাত্রিতে জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন প্রদীপ—যার জ্বলন্ত শিখায় মুক্তি-তীর্থের যাত্রী-দল দেখিয়া লইয়াছে চলার পথ, প্রভুত্বমদান্ধ নিপীড়ক শাসকগোষ্ঠীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের সর্বনাশা নিগ্রহ-নীতির বিরুদ্ধে এবং নিপীড়িত জনগণকে শুনাইয়াছেন অভয়-বাণী। তিনি স্বদেশ ও স্বজাতিকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। স্বদেশবাসীর সুখদুঃখের সহিত তাঁহার নিজের সুখদুঃখ জড়িত হইয়া গিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রতিভাবান কবি এবং দূরদর্শী মনীষী। তজ্জন্য তাঁহার চিন্তাধারাও ছিল অগ্রগামী। দেশ স্বাধীন হইবার প্রায় অর্ধ শতক পূর্বে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্ধ শতকেরও অধিক কাল পূর্বে তিনি তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া যে ভাব, আদর্শ, নীতি, পন্থা মতামতাদি প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে জাতির উপকার হইয়াছে যথেষ্ট। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী যদি ওই সমুদয় নিরপেক্ষ ও মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেন, তাঁহাদের উপকারও কম হইত না। ইংরাজ-চরিত্রের একটা বিশেষ ত্রুটি দেখাইয়া তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমাদের প্রাচীন পুরাণে ইতিহাসে পাঠ করা যায় যে, চরিত্রে বা আচরণে একটা ছিদ্র না পাইলে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিতে পথ পায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রত্যেক জাতিরই প্রায় একটা কোনো ছিদ্র থাকে। আরো দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যেখানে মানুষের দুর্বলতা সেইখানে

তাহার স্নেহও বেশী। ইংরাজও আপনার চরিত্রের মধ্যে ঔদ্ধত্যকে যেন কিছু বেশী গৌরবের সহিত পালন করে। তাহার দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সে যে অটল এবং ভ্রমণ অথবা রাজত্ব উপলক্ষে সে যাহাদের সংস্রবে আসে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিবার যে কিছু মাত্র প্রয়াস পায় না, সাধারণ "জন্" পুঙ্গব এই গুণটিকে মনে মনে কিছু যেন শ্লাঘার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে। তাহার ভাবখানা এই যে, ঢেঁকি যেমন স্বর্গেও ঢেঁকি, তেমনি ইংরাজ সর্বত্রই খাড়া ইংরাজ, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবার জো নাই।

"এই যে মনোহারিত্বের অভাব, এই যে অনুচর আশ্রিতবর্গের অন্তরঙ্গ হইয়া তাহাদের মন বুঝিবার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা, এই যে সমস্ত পৃথিবীকে নিজের নিজের সংস্কার অনুসারেই বিচার করা, ইংরাজের চরিত্রের এই ছিদ্রটি অলক্ষীর একটা প্রবেশপথ।"

যে প্রবন্ধটি হইতে ওই উদ্ধৃতি দিলাম, তাহা লিখিত হইয়াছিল আমাদের স্বাধীনতালাভের পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে ১৩০০ সালে। তৎকালে আমাদের দেশ রাজনীতিক্ষেত্রে এতটা অগ্রসর হয় নাই যে, নির্ভীকভাবে অপ্রিয় সত্য বলিবার মতো সাহসী লোক দেশে বেশী ছিল। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ("ইংরাজ ও ভারতবাসী") রবীন্দ্রনাথ শাসক জাতি হিসাবে ইংরাজের চরিত্র, মনোভাব ও শাসন-নীতির বিচার বিশ্লেষণ করিয়া যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সৎসাহস বিচার-ক্ষমতা ও রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় মিলিবে। আরও উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"রাজ্য জয় করিয়া গৌরব এবং লাভ আছে, রাজ্য সুশাসন করিয়া ধর্ম এবং অর্থ আছে, আর রাজাপ্রজার হৃদয়ের মিলন স্থাপন করিয়া কি কোনো মাহাত্ম্য এবং কোনো সুবিধা নাই? বর্তমান কালের ভারত-রাজনীতির সেই কি সর্বাপেক্ষা চিন্তা এবং আলোচনার বিষয় নহে?···

"ইংলণ্ড উত্তরোত্তর ভারতবর্ষকে তাঁহাদেরই রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গোরুটির মতো দেখিতেছেন। গোয়াল পরিষ্কার রাখিতে এবং খোল বিচালি যোগাইতে কোনো আলস্য নাই, এ অস্থাবর সম্পত্তিটি যাহাতে রক্ষা হয় সে পক্ষে তাঁহাদের যত্ন আছে, যদি কখনো দৌরাত্ম্য করে সেজন্য শিং দুটা ঘসিয়া দিতে ঔদাসীন্য নাই এবং দুই বেলা দুগ্ধ দোহন করিয়া লইবার সময় কৃশকায় বৎসগুলোকেও বঞ্চিত করে না।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রাজনীতিক প্রবন্ধে কেবল রাজপক্ষের সমালোচনা করিয়া কর্তব্য সমাধা করেন নাই। আত্মবিচার এবং আত্মবিশ্লেষণও করিয়াছেন তিনি; স্বজাতীয়গণের দোষ-ত্রুটিও দেখাইয়া দিয়াছেন। আমাদের জাতীয় জীবনে দীর্ঘকাল ধরিয়া হয় বক্তৃতা না হয় সংবাদপত্রে লেখা এবং রাজ-দরবারে আবেদন নিবেদন পেশ করা ছিল—রাজনীতিক আন্দোলনের একমাত্র কার্যক্রম। তিনি ইহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কাজের মতো কাজ কিছু না করিয়া কেবল পূর্বোক্ত কার্যক্রম অনুসরণে দেশের প্রকৃত অগ্রগতি সাধিত হইবে না—ইহাই ছিল তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এবং অন্যান্য লেখায় তাঁহার সেই অভিমত প্রকাশ পাইয়াছে। ওই প্রবন্ধেরই একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কী অস্ত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম? কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন? কী বর্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি? কেবল ছদ্মবেশ? এমন করিয়া কত দিনই বা কাজ চলে এবং কতটুকুই বা ফল হয়?

"একবার নিজেদের মধ্যে অকপটচিত্তে সরলভাবে স্বীকার করিতে দোষ কী, যে, এখনও আমাদের চরিত্রবল জন্মে নাই? আমরা দলাদলি ঈর্ষা ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ। আমরা একত্র হইতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, আপনাদের মধ্যে কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলি বৃহৎ বুদ্বুদের মতো ফুটিয়া যায়; আরম্ভে

ব্যাপারটা খুব তেজের সহিত উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে, দুইদিন পরেই সেটা প্রথমে বিচ্ছিন্ন, পরে বিকৃত, পরে নির্জীব হইয়া যায়। যতক্ষণ না যথার্থ ত্যাগ স্বীকারের সময় আসে ততক্ষণ আমরা ক্রীড়াসক্ত বালকের মতো একটা উদ্যোগ লইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকি, তারপরে কিঞ্চিৎ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইলেই আমরা নানান্ ছুতায় স্ব স্ব গৃহে সরিয়া পড়ি। আত্মাভিমান কোন কারণে তিল মাত্র ক্ষুণ্ণ হইলে উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের আর কোনো জ্ঞান থাকে না। যেমন করিয়া হৌক কাজ আরম্ভ হইতে না হইতেই তপ্ত তপ্ত নামটা চাই। বিজ্ঞাপন, রিপোর্ট, ধূমধাম এবং খ্যাতিটা যথেষ্ট পরিমাণে হইলেই আমাদের এমনি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ হয় যে, তাহার পরেই প্রকৃতিটা নিদ্রালস হইয়া আসে; ধৈর্যসাধ্য, শ্রমসাধ্য নিষ্ঠাসাধ্য কাজে হাত দিতে আর তেমন গা লাগে না।"

প্রাক্-স্বদেশী যুগে রচিত রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছি:—"রাজনীতির দ্বিধা" (১৩০০), "অপমানের প্রতিকার" (১৩০১ সাল), "সুবিচারের অধিকার" (১৩০১), "কণ্ঠরোধ" (১৩০৫ সাল), "অত্যুক্তি" (১৩০৯ সাল)। শেষোক্ত দুইটি প্রবন্ধের মধ্যে "কণ্ঠরোধ" প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল 'সিডিসন বিল' পাশ উপলক্ষে এবং কলিকাতা 'টৌনহলে' (Town Hall-এ) এক বিরাট জনসভায় রবীন্দ্রনাথ তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। "অত্যুক্তি" প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল দিল্লী-দরবারের উদ্যোগ-কালে। ওই সমুদয় প্রবন্ধে তিনি দেশের তৎকালীন কয়েকটি প্রধান সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি আলোচনা কিংবা সমালোচনা করিয়াই কর্তব্য সমাধা করিতেন না; প্রয়োজন মতে পথের সন্ধানও দিতেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতে রাজপক্ষ প্রজাপক্ষের উপর অভদ্র ও অন্যায় আচরণ করিয়া আসিয়াছে—কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা নৃশংস ও বর্বরোচিত

বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দুই দশকে তৎসম্পর্কে দেশবাসীর মনে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়, তাহা সংবাদপত্র ও সভা-সমিতির মাধ্যমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন :—

"এ কথা কিছুতেই আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আইনের সাহায্যে সম্মান পাওয়া যায় না—সম্মান নিজের হস্তে। আমরা সানুনাসিক স্বরে যে ভাবে ক্রমাগত নালিশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহাতে আমাদের আত্মমর্যাদার নিরতিশয় লাঘব হইতেছে।...

..."হঠাৎ রাগিয়া প্রহার করিয়া বসা পুরুষের দুর্বলতা, কিন্তু মার খাইয়া বিনা প্রতিকারে ক্রন্দন করা কাপুরুষের দুর্বলতা।"

ইংরাজের হাতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার জন্য তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকেই দায়ী করিয়াছেন বেশী ; কেননা তাহাদের আত্মমর্যাদা বোধের অভাব এবং চারিত্রিক দুর্বলতার দরুনই ইংরাজ ওইরূপ ব্যবহার ও আচরণ করিতে সাহস পায়। স্বদেশবৎসল কবির মতে—

"এক বাঙালী যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙালী যখন তাহা কৌতূহল-ভরে দেখে এবং স্বহস্তে অপমানের প্রতিকার সাধন বাঙালীর নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না, একথা যখন বাঙালী বিনা লজ্জায় ইঙ্গিতেও স্বীকার করে তখন ইহা বুঝিতে হইবে, যে, ইংরাজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের নিজ স্বভাবের মধ্যে—গবর্মেণ্ট কোন আইনের দ্বারা বিচারের দ্বারা তাহা দূর করিতে পারিবেন না।"

কেন যে পারিবেন না তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে সহজেই বুঝা যাইতে পারে :—

"...ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট আমরা অনেক প্রত্যাশা করিতে পারি, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম বিপর্যস্ত করা তাঁহাদেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। হীনত্বের প্রতি আঘাত ও অবমাননা সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম।"

আমাদের জাতীয় চরিত্রে হীনত্বের সৃষ্টি হইল কি করিয়া তাহাও দূরদর্শী মনীষী বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন; এবং তাহাতে প্রতিকারের উপায়েরও সন্ধান মিলিবে। তিনি লিখিয়াছেন :—

"বাঙালীর প্রতি বাঙালী কিরূপ ব্যবহার করে সেইটে গোড়ায় দেখা উচিত। কারণ তাহারই উপর আমাদের সমস্ত শিক্ষা নির্ভর করে। আমরা কি আমাদের ভৃত্যদিগকে প্রহার করি না, আমাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি ঔদ্ধত্য এবং নিম্নশ্রেণীদিগের প্রতি সর্বদা অসম্মান প্রকাশ করি না? আমাদের সমাজের স্তরে স্তরে উচ্চে নীচে বিভক্ত, যে ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চে আছে সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিমিত অধীনতা প্রত্যাশা করে। নিম্নবর্তী কেহ তিলমাত্র স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিলে উপরের লোকের গায়ে তাহা অসহ্য বোধ হয়। ভদ্রলোকের "চাষা বেটা" প্রায় মনুষ্যের মধ্যেই নহে;—ক্ষমতাপন্নের নিকট অক্ষম লোক যদি সম্পূর্ণ অবনত হইয়া না থাকে তবে তাহাকে ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। যেমন দেখা যায় চৌকিদারের উপর কন্‌ষ্টেবল, কন্‌ষ্টেবলের উপর দারোগা, কেবল যে গবর্মেণ্টের কাজ আদায় করে তাহা নহে, কেবল যে উচ্চতর পদের উচিত সম্মানটুকু গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হয় তাহা নহে, তদতিরিক্ত দাসত্ব দাবী করিয়া থাকে—চৌকিদারের নিকট কন্‌ষ্টেবল যথেচ্ছাচারী রাজা, এবং কন্‌ষ্টেবলের নিকট দারোগাও তদ্রূপ, তেমনি আমাদের সমাজে সর্বত্র অধস্তনের নিকট উচ্চতনের দাবীর একেবারে সীমা নাই। স্তরে স্তরে প্রভুত্বের ভার পড়িয়া দাসত্ব এবং ভয় আমাদের মজ্জার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। আমাদের আজন্ম-কালের প্রতি-নিয়ত অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে, তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস

হইতে শিক্ষা করি। সেই আমাদের প্রতি মুহূর্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত ও জাতীয় অসম্মানের মূল নিহিত রহিয়াছে।"

এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ রাজনীতিবিদেরা ইংরাজের উপর তীক্ষ্ণ বাক্য-বাণ হানিয়া গায়ের ঝাল মিটাইয়াছেন; উষ্মা প্রকাশ করিতে যাইয়া ধৈর্য হারাইবার ফলে স্বদেশবাসীদিগের সামাজিক জীবন বা জাতীয় চরিত্রের মূল ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো সেই শ্রেণীর কেহ নহেন, তিনি অসাধারণ ব্যক্তি—লোকাতীত প্রতিভা ও মনীষার অধিকারী; তাঁহার চিন্তাধারা, বিচার-বিশ্লেষণ, সমালোচনাদির মধ্যে রহিয়াছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন। আলোচ্য বিষয়ে প্রতিকারের পন্থা রহিয়াছে—আমাদের সামাজিক জীবন বা জাতীয় চরিত্রের গোড়ায় সঞ্চিত গলদ দূর করার মধ্যে। সেইজন্যই তিনি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন ওই গোড়ায় গলদের দিকে।

পরাধীন ভারতের হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ ছিল সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর ভেদনীতি উহার স্রষ্টা। পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধাবলীর একটিতে রবীন্দ্রনাথ সেই জটিল বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। সেই বিবাদের জন্য তিনি ইংরাজকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র বা তীক্ষ্ণ ভাষা ব্যবহার করেন নাই কিংবা ইংরাজ রাজপটে আসীন বলিয়া প্রতিকারের জন্য তাঁহাদের নিকট কোন আবেদনও জানান নাই। কেননা তিনি চিন্তাশীল দূরদর্শী মনীষী বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ওইরূপ বিবাদের দায়িত্ব ভারতবাসীরই বেশী এবং প্রতিকারও রহিয়াছে তাঁহাদেরই হাতে। আলোচনার আরম্ভেই তিনি সোজা বলিয়া দিয়াছেন :—

"গবর্মেণ্টের নিকট সকরুণ অথবা স্বাভিমান স্বরে আবেদন বা অভিযোগ করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখিবার কোনো আবশ্যক নাই সে কথা

আমি সহস্রবার স্বীকার করি। আমাদের এই প্রবন্ধ কেবল আমাদের স্বজাতীয়ের জন্য। আমরা নিজেরা ব্যতীত আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকারও সাধ্যায়ত্ত নহে।”

এই কারণে তিনি তাঁহার স্বজাতীয়গণকে বলিয়াছেন :—

“আমরা জানি, বহুকাল পরাধীনতায় পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় মনুষ্যত্ব ও সাহস চূর্ণ হইয়া গেছে, আমরা জানি যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে—যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ, আমরা যাহার সহায়তা করিতে যাইব তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না, কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে এবং জেলখানা আপন লৌহ-বদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে ; কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম মহত্ব ও স্বাভাবিক ন্যায়প্রিয়তা বশতঃ আমাদের মধ্যে দুইচারি জন লোকও যখন শেষ পর্যন্ত অটল থাকিতে পারিবে, তখন আমাদের জাতীয় বন্ধনের সূত্রপাত হইতে থাকিবে এবং তখন আমরা ন্যায়বিচার পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইব।”

আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অভিমত আরও পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন এই বলিয়া :—

“কেবলমাত্র বিচারকের অনুগ্রহ ও কর্তব্যবুদ্ধির উপর বিচারভার রাখিয়া দিলে সুবিচারের অধিকারী হওয়া যায় না। রাজতন্ত্র যতই উন্নত হউক প্রজার অবস্থা নিতান্ত অবনত হইলে সে কখনই আপনাকে উচ্চে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, কারণ মানুষের দ্বারাই রাজ্য চলিয়া থাকে, যন্ত্রের দ্বারাও নহে, দেবতার দ্বারাও নহে। তাহাদিগের নিকট যখন আমরা আপনাদিগকে মনুষ্য বলিয়া প্রমাণ দিব তখন

তাহারা সকল সময়েই আমাদের সহিত মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। যখন ভারতবর্ষে অন্ততঃ কতকগুলি লোকও উঠিবেন যাঁহারা আমাদের মধ্যে অটল সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীক ন্যায়পরতার উন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন, যখন ইংরাজ অন্তরের সহিত অনুভব করিবে যে ভারতবর্ষ ন্যায়বিচার নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করে না, সচেষ্টভাবে প্রার্থনা করে, অন্যায় নিবারণের জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, তখন তাহারা কখনও ভ্রমেও আমাদিগকে অবহেলা করিবে না এবং আমাদের প্রতি ন্যায়বিচারে শৈথিল্য করিতে তাহাদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইবে না।"

সিডিশন বিল পাশ উপলক্ষ্যে লিখিত "কণ্ঠরোধ" প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ শাসকগোষ্ঠীকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ওইরূপ নিগ্রহনীতির ফল অকল্যাণকর হইবে। প্রজাপক্ষের অন্তরে পোষিত অসন্তোষ প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশের ন্যায়-সম্মত পথ না পাইয়া গোপনে-গোপনে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, কেবল তাহাই নহে, সেই বর্ধিত অসন্তোষ কোন-না-কোন উপায়ে নিজকে প্রকাশিত করিবেই।—এইরূপ অভিমতও তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে হাতে হাতে যে রুটি বিলি হইয়াছিল তাহাতে একটি অক্ষরও লেখা ছিল না। সেই নির্বাক নিরক্ষর সংবাদ-পত্রই কি যথার্থ ভয়ঙ্কর নহে? সর্পের গতি গোপন এবং দংশন নিঃশব্দ সেই জন্যই কি তাহা নিদারুণ নহে? সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না।"

তিনি আরও বলিয়াছেন :—"অন্তর্দাহ বাক্যে প্রকাশ না হইলে অন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে। সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর অস্বাভাবিক অবস্থায় রাজাপ্রজার সম্বন্ধ যে কিরূপ বিকৃত হইবে তাহা কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইতেছি।"

"কণ্ঠরোধ" প্রকাশিত হইবার মাত্র বৎসর দশেক পরে বাংলা দেশে বিপ্লবের অগ্নিযুগের আরম্ভেই সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়া দূরদর্শী মনীষীর আশঙ্কা সত্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। বিষয়টির আলোচনা সমাপ্ত করার কালে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজ শাসকদের যে প্রশ্নটি করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাবরণ উত্তোলন করিয়া লইলে আমাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কঙ্কাল এক মুহূর্তে বাহির হইয়া পড়িবে। আজকালকার কোনো জবরদস্ত ইংরাজ লেখক বলেন যাহা সত্য তাহা অনাবৃত হইয়া থাকাই ভালো। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি ইংরাজ শাসনে এই কঠিন শুষ্ক পরাধীনতার কঙ্কালই কি একমাত্র সত্য, ইহার উপরে জীবনের লাবণ্যের যে আবরণ, স্বাধীন গতিভঙ্গীর যে বিচিত্র লীলা মনোহর শ্রী অর্পণ করিয়াছিল তাহাই কি মিথ্যা, তাহাই কি মায়া? দুই শত বৎসরের পরিচয়ের পরে আমাদের মানব-সম্বন্ধের এই কি অবশেষ?"

প্রাক্-স্বদেশী যুগের রাজনীতিক রচনাবলীর মধ্যে "স্বদেশী সমাজ" অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। ১৩১১ সালে "বাংলা দেশে জলকষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে পর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।" পরবর্তী বৎসর ১৩১২ সালের শ্রাবণ মাসে (১৯০৫ খৃষ্টাব্দের আগস্টে) ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদে আরম্ভ হইল বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের আন্দোলন। আমাদের জাতীয় জীবনে তদবধি যে যুগ চলিতে থাকে, তাহা স্বদেশী যুগ বলিয়া অভিহিত। সেই যুগের শেষ হয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজকীয় ঘোষণায় বঙ্গ-বিভাগ রহিত হওয়ার সঙ্গে। "স্বদেশী সমাজ"-এর ভিতর আমরা পাইব বাংলার উপেক্ষিত পল্লীসমূহ পুনর্গঠনের একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং দেশ জাতি ও

সমাজের প্রতি আমাদের নিজ নিজ কর্তব্য পালনের আকুল আহ্বান। সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তৎকালে অনুসৃত আবেদন-নিবেদন নীতির ব্যর্থতা সম্বন্ধে স্বদেশবাসীগণকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে বাংলা দেশে রাজনীতিক্ষেত্রে সেই কার্যক্রমের সমর্থক দল তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া তাঁহার যুক্তিকে খণ্ডন করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তজ্জন্য তাঁহাকে "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের পরিশিষ্ট নামে আর একটি প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছিল। দেশভক্ত কবি উপেক্ষিত পল্লীর দুর্দশার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন কিরূপ প্রাণস্পর্শী ভাষায় তাহা শুনাইতেছি:—

"কোনো নদী যে গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে, সে যদি একদিন সে গ্রামকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে-গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান নষ্ট হয়, তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্বসমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন দীর্ণ ভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থকে প্রশ্রয় দিয়া পেচক-বাদুড়ের বিহার-স্থল হইয়া উঠে।

"মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিস নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল—এখন বাংলায় সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালীর চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে! তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত —পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত —সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না।"...

পল্লীগুলিকে পুনর্গঠিত করিতে হইলে এবং পল্লী-সমাজকে আবার সজীব করিয়া তুলিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের মতে যে সকল পন্থা অবলম্বন

করা বা নীতি অনুসরণ করা আবশ্যক, তন্মধ্যে দুইটির উল্লেখ করিতেছি। প্রথমটি এই :—

"আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করে। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।

"এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষ্যে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষ্যে যাহারা একত্র হয়, তাহাদের সহজেই হৃদয় খুলিয়া যায়—সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগুলি যেদিন হাল-লাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেই দিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।"

অপরটি হইল এই :—"স্বদেশকে একটি ব্যক্তির মধ্যে উপলব্ধি করিতে চাই। প্রথম এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমাজের প্রতিমা-স্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশী সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।

"পূর্বে যখন রাষ্ট্র সমাজের সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল, তখন রাজারই বড় পদ ছিল। এখন রাজা সমাজের বাহিরে যাওয়াতে সমাজ শীর্ষহীন

হইয়াছে। সুতরাং দীর্ঘকাল হইতে বাধ্য হইয়া পল্লী সমাজই খণ্ড খণ্ড ভাবে আপনার কাজ আপনি নিষ্পন্ন করিয়াছে—স্বদেশী সমাজ তেমন ঘনিষ্ঠভাবে গড়িয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই।...

"এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদসভা থাকিবে, কিন্তু তিনিই প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।"

রবীন্দ্রনাথ আবেদন-নিবেদন নীতির নিন্দা করিয়াছেন "রাজদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি" বলিয়া। "স্বদেশী সমাজ" প্রকাশিত হওয়ার বৎসর তিনেক পরে স্বদেশী যুগের দ্বিতীয় পর্ব হইতেই সেই নীতির নিন্দা দেশে ব্যাপক-ভাবে প্রচারিত হইতে থাকে। সুতরাং তিনি যে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রেও অগ্রগামী চিন্তানায়কগণের অন্যতম, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সেই অনবদ্য প্রবন্ধটির মধ্য দিয়া ওই নীতি সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"যাঁহারা রাজদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিকে দেশের মঙ্গল-ব্যাপার বলিয়া গণ্যই করেন না তাঁহাদিগকে অন্য পক্ষে "পেসিমিষ্ট" অর্থাৎ আশাহীনের দল নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ রাজার কাছে কোনো আশা নাই বলিয়া আমরা যতটা হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি, ততটা নৈরাশ্যকে তাঁহারা অমূলক বলিয়া জ্ঞান করেন।

"আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি, কোনো দিনই আমি এরূপ দুর্লভ দ্রাক্ষাগুচ্ছলুব্ধ শৃগালের সান্ত্বনাকে আশ্রয় করি নাই। আমি এই কথাই বলি, পরের প্রসাদ ভিক্ষাই যথার্থ "পেসিমিষ্ট" আশাহীন দীনের লক্ষণ। গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, একথা আমি কোনো মতেই

বলিব না—আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে যে উপায়েই হউক, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতা লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনই ব্যর্থ হইতে থাকিবে। অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে কী, আমাদিগকে চারি দিক হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের আশা বিফল হয় নাই। পূর্বোক্ত অভিমত ব্যক্ত করার প্রায় বৎসর পনর পরে গান্ধী-যুগে মুক্তিকামী জাতি "যথার্থ পথটি যে কী" তাহার সন্ধান পাইয়াছে, এবং "রাজদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি" ছাড়িয়া "যথার্থ পথটি" ধরিয়াই চলিয়াছে। জাতি সেই পথের পথিক হইয়া কঠোর সাধনা করিয়া প্রায় আঠাশ বৎসর পরে লাভ করিয়াছে স্বাধীনতা। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, "স্বদেশী সমাজ" লিখিত হইবার অনধিক একুশ বৎসর পূর্বে দূরদর্শী কবি স্বরচিত একটি জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়া "রাজদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তির" প্রতিকূলে অনুরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গীতের কয়েকটি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"মিছে—কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা,
চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
বহে' বহে' নতশির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছিছি একি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিনে আপনার কাজ,
পরের 'পরে অভিমান।

ওগো—আপনি নামাও কলঙ্ক পসরা,
যেয়ো না পরের দ্বার।
পরের পায়ে ধ'রে মানভিক্ষা করা
সকল ভিক্ষার ছার।"

দেশের ভাবী নেতা কে হইবেন এবং তাহার মধ্যে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার প্রায় বারো বৎসর পূর্বে একটি প্রবন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তাহা পাঠে মনে হয়, যেন ঋষি-কবির দৃষ্টিতে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সেই মহানায়কের যথার্থ প্রকৃতি, রূপ ও গুণ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। কবিগুরুর ভবিষ্যদ্বাণী এই :—

"শিখদিগের শেষ গুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া নানা জাতির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতি-সাধন পূর্বক তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবার্য-বেগে অন্ধকারে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহু যত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিত জ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে—তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হোক সহসা চৈতন্য হইবে এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্তী হইয়া চোখ বুজিয়া সঙ্কটের পথে চলিতেছিলাম, সেইটাই পতনের উপত্যকা।

"আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই; তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরাজি কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না, তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে মূঢ় স্রোতের আবর্ত হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন, কোনো একটা বিশেষ আইন সংশোধন বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের কোনো যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন; আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি চতুর্দিককে যেন উদার বিশ্বগ্রাহী হৃদয় দিয়া নীরবে শোষণ করিয়া লইতেছেন; এবং বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টিপাত করিয়া দেবতার নিকট একান্ত-মনে প্রার্থনা করিতেছেন যেন এখনকার দিনের মিথ্যা তর্ক ও বাঁধি কথায় তাঁহাকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে এবং দেশের লোকের বিশ্বাসহীন নিষ্ঠাহীনতায় উদ্দেশ্য সাধন অসাধ্য বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া না দেয়। অসাধ্য বটে, কিন্তু এদেশের যিনি উন্নতি করিবেন অসাধ্য সাধনই তাঁহার ব্রত।"

প্রাক্-স্বদেশী যুগের প্রবন্ধ-সাহিত্য ছাড়াও কবিতাবলীর মধ্যে আমরা বিশ্বপ্রেমিক, স্বদেশভক্ত, স্বজাতিবৎসল, পরদুঃখকাতর রবীন্দ্রনাথের দর্শন পাইব। কোন কোন কবিতায় আমরা শুনিতে পাইব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান—পৌরুষ ও সাহসের বজ্রবাণী। নিম্নে ওই শ্রেণীর কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করিতেছি :— "'এবার ফিরাও মোরে", "দুইবিঘা জমি," "স্বর্গ হইতে বিদায়," "বঙ্গমাতা," "স্নেহগ্রাস," প্রার্থনা", "ন্যায়দণ্ড," "ত্রাণ," "বন্দীবীর," "গান্ধারীর আবেদন," "শিবাজী উৎসব।" এই সকল কবিতা এবং পূর্বোক্ত প্রবন্ধাবলী রবীন্দ্রনাথের যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের রচনা।

কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, যেহেতু বিস্তারিত আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইয়া পড়িবে।

দরদী কবির মর্মবাণী শুনিতে পাইব এই কয়েকটি কলির মধ্যেও—

"বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।"

"এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় অনুরূপ পদ আরও রহিয়াছে।

"দুই বিঘা জমি" হইতে বঙ্গভূমির হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা শুনাইতেছি :—

"নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি,
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদ-ধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি-কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভ'রে।"

বাঙালী ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে অগ্রগামী এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলা ও বাঙালীর স্মরণীয় অবদান রহিয়াছে। কিন্তু একদা বাঙালীকে ভেতো, কুনো ইত্যাদি বলিয়া উপহাস করা হইত,—বাক্যবাগীশ, দুর্বল, ভীরু-কাপুরুষ ইত্যাদি অপবাদের মসী বাঙালীর গায়ে কম ছিটানো হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত তাহা অবাধে চলিয়াছিল। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রাণে দারুণ

আঘাত লাগে। "বঙ্গমাতা" কবিতায় সেই মর্মবেদনার কিরূপ অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা শুনাইতেছি :—

"পুণ্যপাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।
সাত কোটি সন্তানের, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করোনি॥"

পূর্বোক্ত কবিতাটি রচিত হইয়াছিল ১৩০২ সালের ২৬-এ চৈত্র। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে বয়কট আন্দোলন—(যাহা স্বদেশী আন্দোলন নামেও অভিহিত)—আরম্ভ হইয়াছিল প্রায় সাড়ে নয় বৎসর পরে ১৩১২ সালের শ্রাবণ মাসে। সেই আন্দোলন বাঙালীর জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার অবদানও যথেষ্ট রহিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য পর্বে বিপ্লবের অগ্নি-যুগে যখন যুগ-দেবী রণচণ্ডী মূর্তিতে প্রকট হইলেন, তখন বাঙালীর রূপান্তর দেখিতে পাইয়া কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়— সকলেই বিস্মিত হইয়া গেল! ভক্ত সন্তানের জীবিত কালেই তাঁহার

মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন বঙ্গমাতা। "স্নেহার্ত বঙ্গভূমি" তাঁহার "শীর্ণ শান্ত সাধু" পুত্রদের পরাক্রমশালী দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ করিয়া তুলিলেন,—গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দিলেন স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণার্থ।

স্বদেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ যে কত গভীর, তাহার সুস্পষ্ট প্রকাশ "ত্রাণ" কবিতায়ও দেখিতে পাই। পরাধীন দেশের কবি হইয়াও তিনি নির্ভীক-চিত্তে মুক্ত-কণ্ঠে জন্মভূমির ত্রাণ কামনা করিয়াছেন এই বলিয়া :—

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়,
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
... .
এই দাসত্বের রজ্জু, ...
... ...
চূর্ণ করি' দূর করো। মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে॥"

এই ত্রাণ-কামনায় দেশভক্ত সন্তানের অন্তরের যে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রাণস্পর্শী! তাঁহার মনোবাঞ্ছা মঙ্গলময় যে অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণ করিবেন, তৎসম্বন্ধে তিনি জীবদ্দশায় নিশ্চিত হইতে পারিয়াছিলেন।

"রাজাধিরাজ" বিশ্বনিয়ন্তা "প্রত্যেকের করে অর্পণ" করিয়াছেন তাঁহার "ন্যায়দণ্ড"—দিয়াছেন "প্রত্যেকের 'পরে শাসনভার"। "সে গুরু সম্মান"—"সে দুরূহ কাজ" কবি "শিরোধার্য" করিয়াছেন। কবি-চিত্তের ঐকান্তিক কামনা :—

"...তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে॥

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হোতে পারি তথা
তোমার আদেশে, যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি' উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে, যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে, আর, অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে ॥"

স্বদেশপ্রাণ কবি চাহিয়াছেন—তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি ভারতবর্ষ যেন একটা আদর্শ দেশ-রূপে গড়িয়া উঠে এবং জগৎ-সভায় সম্মানের মহোচ্চ আসন লাভ করে। তাঁহার সেই মনোবাসনার অভিব্যক্তি হইয়াছে "প্রার্থনা" কবিতার মধ্য দিয়া। আংশিক উদ্ধৃতি হইতেও নিদর্শন মিলিবে :—

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, … …
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥"

কবি স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন—মুক্তির সংকল্প লইয়া, পর্বত-প্রমাণ বিঘ্ন-বিপদ অতিক্রম করিয়া, ভারতবাসী দুর্নিবার-বেগে অগ্রসর হইতেছে লক্ষ্যস্থলে। কিন্তু তিনি স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তরের প্রার্থনা শুনিয়াছেন বিশ্বপিতা—যিনি 'ভারতেরে সেই স্বর্গে' 'জাগরিত' করিতেছেন।

॥ স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ ॥

প্রথম প্রস্তাব

এক

বিংশ শতকের প্রথম দশকে পরাধীন ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন জনমত উপেক্ষা করিয়া বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনার মূলে ছিল রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ পলিটিশিয়ানের কূট-বুদ্ধির প্রেরণা। তৎকালে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কংগ্রেস জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় ভারতবাসীগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার হইতেছে এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিবার জন্য তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইতেছে—বুঝিতে পারিয়া এই বিদেশী শাসক কংগ্রেসের প্রতি বৈরভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাও দেখিতে পাইলেন যে, বাংলার ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজ, বিশেষ করিয়া ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা প্রধানত ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া কাজ করিতেছেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে বাঙালীর অগ্রগতি রোধ করিতে পারিলে ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে ধ্বংস করা সহজ হইবে, ইহাই ছিল লর্ড কার্জনের ধারণা। এই দুরভিসন্ধিকে সফল করিবার পন্থা আবিষ্কৃত হইল বঙ্গ-বিভাগের পরিকল্পনায়। ইহার দ্বারা বঙ্গভূমির অখণ্ডতা বিলুপ্ত হইবে, বঙ্গভাষা-ভাষী বাঙালী জাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং বাঙালীর নবজাগ্রত সংহতি-শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। এই দুরাশাই লর্ড কার্জনের দৃষ্টিপথে কুয়াশা-জাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল।

বঙ্গ-ভঙ্গ হইতেই উদ্ভব হইল বিলাতী পণ্য বর্জন ও স্বদেশজাত দ্রব্য গ্রহণের আন্দোলন। আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ইহা 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই আন্দোলনকে বাংলার জাতীয় জীবনে 'রিন্যাসেন্‌স' বা নবজাগৃতির যুগ বলা যাইতে পারে। *ইহার ফলে বাংলার রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, অর্থনীতি, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ ক্ষেত্রে অল্পকাল মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হইল।*

স্বদেশী আন্দোলনকে সফল ও সার্থক করিবার জন্য যে সকল বরেণ্য বাঙালী আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের অনুপম রচনার মধ্য দিয়া দেশপ্রেমের জাহ্নবী-ধারা প্রবাহিত হইল। তাঁহার লেখনী-মুখে নির্গত হইল নব নব বাণী ও ভাবধারা এবং তাঁহার কণ্ঠে গীত হইল নব নব সঙ্গীত। সে বাণী নিদ্রালস বাঙালীর শ্রবণে ঝঙ্কৃত হইল রক্তিম উষায় প্রভাত-কাকলীর মতো, সে ভাবধারায় বাংলার মরা গাঙে বান ডাকিল, সে সঙ্গীত বাঙালীকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিল।

বঙ্গ-ভঙ্গের পরিকল্পনার প্রতিবাদে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (১৩১২ বঙ্গাব্দ ২২-এ শ্রাবণ) কলিকাতা টাউন হলে বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। টাউন হলের দ্বিতলে স্থান সংকুলান না হওয়ায় নিম্নতলে দ্বিতীয় সভা এবং নিকটস্থ ময়দানে তৃতীয় সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তিনটি সভা একই সময়ে তিন জন সভাপতি কর্তৃক পরিচালিত হইল এবং তিনটি সভায় বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদের সঙ্গে বিলাতী পণ্য বর্জনের প্রস্তাবও গৃহীত হইল। কলিকাতা পুলিসের বিবরণ অনুসারে তিন সভায় অন্যূন পঁচিশ হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। দ্বিতলের মূল সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। জাতীয় আন্দোলন উপলক্ষ্যে ওই দিন সর্বপ্রথম

শোভাযাত্রা বাহির করিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। শোভাযাত্রায় ও সভাস্থলে সেদিন বাঙালীর মিলিত কণ্ঠে সর্বপ্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল নবজাগ্রত জাতির নিজস্ব জয়ধ্বনি 'বন্দে মাতরম্'। ৭ই আগস্টের সেই ঐতিহাসিক দিবসে ভারতবর্ষের প্রাণ-কেন্দ্র কলিকাতা মহানগরীর বুকের উপর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভাবোন্মাদনার যে বন্যা-প্রবাহ নামিয়া আসিয়াছিল, উত্তর কালে উহারই প্লাবনধারা সমগ্র বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল। সে প্রবহমান ধারা বাংলার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সুদূর পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলেও পৌছিয়াছিল।

স্বদেশী যুগে আমরা দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথ চারণ-রূপে গান গাহিয়া দেশবাসীকে মাতাইয়া তুলিতেছেন, কখনও তিনি বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া ভাষণ দিতেছেন কিংবা প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন, আবার কখনও বা জনসভায় সভাপতিত্ব করিতেছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫-এ আগস্ট (১৩১২ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র শুক্রবার) কলিকাতা টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠের জন্য এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বনামখ্যাত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। টাউন হলের দ্বিতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি ইংরেজের রাজনীতি এবং আমাদের দুর্গতির নিপুণ বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীকে আত্মশক্তির উদ্বোধন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। রাজ-দরবারে প্রার্থনা করিয়া ন্যায্য দাবি ও অধিকার প্রাপ্তির চেষ্টাকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন এবং এইরূপ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জাতীয় উন্নতি ও স্বদেশের অগ্রগতি যে সম্ভবপর নহে, তাহা তিনি পূর্বোক্ত প্রবন্ধে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পলিটিক্যাল ভিক্ষাবৃত্তির নিষ্ফলতা এবং আত্মশক্তির উপর নির্ভরের প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ এবং বিপিনচন্দ্র পালের পূর্বে আর কোনও

ভারতীয় নেতা অনুভব করিয়াছিলেন কিনা জানি না। তাঁহাদের পূর্বে যে এই নব ভাব এবং জাতীয়তার নূতন আদর্শ আর কেহ প্রচার করেন নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে যখন ন্যাশনালিস্ট বা জাতীয়তাবাদী দলের উদ্ভব হইল এবং মডারেট বা মধ্যপন্থী দলের সহিত পূর্বোক্ত দলের বিরোধ ঘটিল, তখন রবীন্দ্রনাথ এবং বিপিনচন্দ্রের প্রচারিত পূর্বোল্লিখিত ভাব ও আদর্শই ছিল জাতীয়তাবাদী দলের মূল কথা। পরে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (Passive resistance-এর) নীতিও তাহাতে যুক্ত হইয়াছিল। আমার পূর্বোক্ত মন্তব্যের সমর্থনে মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের লিখিত "বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা" এবং "বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছি। প্রবন্ধ দুইটি যথাক্রমে 'বঙ্গদর্শনে'র ১৩১২ সনের কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সেই অতুলনীয় প্রবন্ধ "অবস্থা ও ব্যবস্থা" হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইল :—

"য়ুরোপ যাহা কিছু পাইয়াছে, তাহা বিরোধ করিয়াই পাইয়াছে, আমাদের যাহা কিছু সম্পত্তি, তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন বিরোধপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে। স্বভাব-বিদ্রোহী স্বভাব-বিশ্বাসীকে শ্রদ্ধাই করে না।

"যাহাই হউক, চিরন্তন প্রকৃতি বশত আমাদের ব্যবহারে যাহাই প্রকাশ পাউক, ইংরেজ রাজা স্বভাবতই যে আমাদের ঐক্যের সহায় নহেন, আমাদের ক্ষমতালাভের অনুকূল নহেন, এ-কথা আমাদের মনকে অধিকার করিয়াছে। সেইজন্যই য়ুনিভার্সিটি সংশোধন, বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি গবর্নমেণ্টের ব্যবস্থাগুলিকে আমাদের শক্তি খর্ব করিবার সংকল্প বলিয়া কল্পনা করিয়াছি।

"এমনতর সন্দিগ্ধ অবস্থার স্বভাবিক গতি হওয়া উচিত—আমাদের

স্বদেশহিতকর সমস্ত চেষ্টাকে নিজের দিকে ফিরাইয়া আনা। আমাদের অবিশ্বাসের মধ্যে এইটুকুই আমাদের লাভের বিষয়। পরের নিকট আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে বদ্ধ করিয়া রাখিলে কেবল যে ফল পাওয়া যায় না, তাহা নহে, তাহাতে আমাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত আত্মশক্তির মাহাত্ম্য চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। এইটেই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। ইংরেজ আমাদের প্রার্থনাপূরণ করিবে না, অতএব আমরা তাহাদের কাছে যাইব না, এ সুবুদ্ধিটা লজ্জাকর। বস্তুত এই কথাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে, অধিকাংশ স্থলেই প্রার্থনা-পূরণটাই আমাদের লোকসান। নিজের চেষ্টার দ্বারা যতটুকু ফল পাই, তাহাতে ফলও পাওয়া যায়, শক্তিও পাওয়া যায়, সোনাও পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে পরশপাথরও পাওয়া যায়। পরের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই ভিক্ষাবৃত্তি হইতে যদি নিরস্ত হইতে হয়, পৌরুষবশত, মনুষ্যত্ব-বশত নিজের প্রতি নিজের অন্তর্যামী পুরুষের প্রতি সম্মানবশত যদি না হয়, তবে এই ভিক্ষাবৈরাগ্যের প্রতি আমি কোন ভরসা রাখি না।···

"এখন তবে কথা এই যে, আমাদের দেশে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতী জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিস কিনিবার জন্য যে সংকল্প করিয়াছি, সেই সংকল্পটিকে স্তব্ধভাবে, গভীরভাবে স্থায়ী মঙ্গলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। আমি আমাদের এই বর্তমান উদ্যোগটির সম্বন্ধে যদি আনন্দ অনুভব করি, তবে তাহার কারণ এ নয় যে তাহাতে ইংরেজের ক্ষতি হইবে, তাহার কারণ সম্পূর্ণভাবে এও নহে যে, তাহাতে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে—এ সমস্ত লাভক্ষতি নানা বাহিরের অবস্থার উপরে নির্ভর করে—সে সমস্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখা আমার ক্ষমতায় নাই। আমি আমাদের অন্তরের লাভের দিকটা দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, আমরা যদি সর্বদা সচেষ্ট হইয়া দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই,

যে-জিনিসটা দেশী নহে, তাহার ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইলে যদি কষ্ট অনুভব করিতে থাকি, দেশী জিনিস ব্যবহারের গতিকে যদি কতকটা পরিমাণে আরাম ও আড়ম্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যদি সেজন্য মাঝে মাঝে স্বদলের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত হই, তবে স্বদেশ আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে। এই উপলক্ষে আমাদের চিত্ত সর্বদা স্বদেশের অভিমুখ হইয়া থাকিবে। আমরা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখ স্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব। আমাদের আরাম, বিলাস, আত্মসুখতৃপ্তি আমাদিগকে প্রত্যহ স্বদেশ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল, প্রত্যহ আমাদিগকে পরবশ করিয়া লোকহিত ব্রতের জন্য অক্ষম করিতেছিল—আজ আমরা সকলে মিলিয়া নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দেশের দিকে তাকাইয়া ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ও আরামের অভ্যাস কিছু পরিমাণও পরিত্যাগ করিতে পারি, তবে সেই ত্যাগের ঐক্যদ্বারা আমরা পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া দেশকে বলিষ্ঠ করিতে পারিব। দেশী জিনিস ব্যবহার করার ইহাই যথার্থ সার্থকতা, ইহা দেশের পূজা, ইহা একটি মহান সংকল্পের নিকটে আত্মনিবেদন।"

এই দীর্ঘ সুচিন্তিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের রাজনীতির সমালোচনার অপেক্ষা আমাদের জাতির দোষ-ত্রুটির বিচার-বিশ্লেষণই বেশি করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শোধরাইবার পথও দেখাইয়া দিয়াছেন। উত্তেজনায় কালক্ষেপ না করিয়া কাজে লাগিয়া যাইবার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন এবং সুপরিকল্পিত কার্যক্রমও দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রবন্ধের আরম্ভেই তিনি বলিয়াছেন—

"আজ বাংলাদেশে উত্তেজনার অভাব নাই, সুতরাং উত্তেজনার ভার কাহাকেও লইতে হইবে না। উপদেশেরও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহা আমি মনে করি না।...

"অতএব আমার মুখে আজ উত্তেজনা ও উপদেশ অনাবশ্যক হইয়াছে—ইতিহাসকে যিনি অমোঘ ইঙ্গিতের দ্বারা চালনা করেন, তাঁহার অগ্নিময় তর্জনী আজ দেশের সকলের চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।"

"এখন এই সময়টাকে বৃথা নষ্ট হইতে দিতে পারি না। কপালক্রমে অনেক ধোঁয়ার পরে ভিজা কাঠ যদি ধরিয়া থাকে, তবে তাহা পুড়িয়া ছাই হইবার পূর্বে রান্না চড়াইতে হইবে; শুধু শূন্য চুলায় আগুনে খোঁচার উপর খোঁচা দিতে থাকিলে আমোদ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ছাই হওয়ার কালটাও নিকটে অগ্রসর হয় এবং অন্নের আশা সুদূরবর্তী হইতে থাকে।..."

তারপর তিনি বিভিন্ন কর্মপন্থা দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন—

"দেশের কাজ বলিতে আর ভুল বুঝিলে চলিবে না—এখন সেদিন নাই,—আমি যাহা বলিতেছি, তাহার অর্থ এই, সাধ্যমত নিজেদের অভাব মোচন করা, নিজেদের কর্তব্য নিজে সাধন করা।"

"এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব, তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব, তাঁহাদিগকে কর দান করিব, তাঁহাদের আদেশ পালন করিব, নির্বিচারে তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিব, তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া আমাদের দেশকে সম্মানিত করিব।

"...কৃষিতত্ত্বপারদর্শীদের লইয়া আমরাও কি আমাদের দেশের কৃষির উন্নতিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না? আমাদের ডাক্তার লইয়া আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধান চেষ্টা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব? আমাদের পল্লীর শিক্ষাভার কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না? যাহাতে মামলা-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ

বিচারপ্রণালীতে সালিস-নিষ্পত্তি দেশে চলে, তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত? সমস্তই সম্ভব হয়, যদি আমাদের এই সকল স্বদেশী চেষ্টাকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য একটা দল বাঁধিতে পারি। এই দল, এই কর্তৃসভা আমাদিগকে স্থাপন করিতেই হইবে— নতুবা বলিব, আজ আমরা যে একটা উত্তেজনা প্রকাশ করিতেছি, তাহা মাদকতা মাত্র, তাহার অবসানে অবসাদের পঙ্কশয্যায় লুণ্ঠন করিতে হইবে।"

ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রাম্য পঞ্চায়েত-বিধি পুনঃপ্রবর্তিত করিয়া গ্রামগুলিকে পুনর্গঠন করিতে এবং গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও মামলা-মকদ্দমার সালিসী বিচার প্রভৃতি কার্য নিজেদের হাতে লইতে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া তিনি গান্ধীজীরও অগ্রগামী। পঞ্চায়েত গঠনের কাজ গবর্মেণ্ট হাতে লইলে ইহার ফল যে সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে, সে সম্বন্ধেও তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। পরবর্তী কালে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে বিদেশী সরকারের রচিত গ্রাম্য-স্বায়ত্তশাসন-আইনের বিধান অনুসারে গঠিত ইউনিয়ন-বোর্ডগুলি সুদৃঢ় সরকারী ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছিল। এই সমুদয় বোর্ডের মধ্য দিয়া গ্রাম্য জীবনে অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল এবং এইগুলি গ্রামে দলাদলির সৃষ্টি করিয়া গ্রামের শান্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। "অবস্থা ও ব্যবস্থা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন :—

"অতএব আর দ্বিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে। সরকারি পঞ্চায়েতের মুষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্বেই আমাদের নিজের পল্লী-পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চাষীকে আমরা রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং সর্বনেশে

মামলার হাত হইতে জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে—কারণ, এস্থলে সাহায্য লইবার অর্থই দুর্বলের স্বাধীন অধিকারের মধ্যে প্রবলকে ডাকিয়া আনিয়া বসানো।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই অনুপম প্রবন্ধটির পরিসমাপ্তি করিয়াছেন এই ভাবে :—

"ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন, তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি, তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নিচে যদি বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন, যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনওই বঞ্চিত হইব না। বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন হাত বাড়াইলেই পাওয়া যাইবে না, তখনই ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু চিরন্তন প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে, তাহার মূল্য বুঝিব। তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখদুঃখ-লাভক্ষতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব—এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে, তখন ব্রিটিশ শাসনকে বলিব ধন্য—তখনই অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। আমরা যাচিত ও অযাচিত যে-কোনো অনুগ্রহ পাইয়াছি, তাহা যেন ক্রমে আমাদের অঞ্জলি হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে এবং তাহা যেন স্বচেষ্টায় নিজে অর্জন করিয়া লইবার অবকাশ পাই। আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রায় সহায়তা কেহ করিয়ো না—আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—বিধাতার রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ! জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র

উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।"

পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়) ১৩১২ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ যে সকল জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। সে যুগের রবীন্দ্র-সঙ্গীত কখনও বাঙালীর প্রাণকে স্বদেশ-ভক্তির মন্দাকিনী-ধারায় অভিষিক্ত করিয়াছে, কখনও অন্ধকার রাত্রিতে দুর্গম গহন পথের যাত্রীকে আলোক-বর্তিকা জ্বালাইয়া পথের সন্ধান দিয়াছে, কখনও বা পথচারী যাত্রা-পথে সঙ্গীহীন হইয়া পড়িলেও নির্ভয়ে একা চলিবার জন্য তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু সুলেখক নহেন, একজন সুগায়ক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। বাংলার নিজস্ব বাউল সুরে তিনি আমাদের শুনাইলেন "সোনার বাংলা" গানখানি। "সোনার বাংলা" গানের আরম্ভ এইরূপ :—

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে
বাজায় বাঁশি।"

সঙ্গীতের শেষ চরণ এই :—

"ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে;
দে গো তোর পায়ের ধূলো সে-যে আমার মাথায় মানিক হবে।
ও মা গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে—
আমি পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি॥"

কলিকাতা টাউন হলে ২৫-এ আগস্টের যে সভায় রবীন্দ্রনাথ "অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেই সভায় "সোনার বাংলা" সঙ্গীতটি গীত হইয়াছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর

(১৩১২ বঙ্গাব্দ ২২-এ ভাদ্র) তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার অতিরিক্ত পত্রে পূর্বোক্ত "সোনার বাংলা" গানটি এবং রবীন্দ্রনাথের "নব বর্ষের গান" নামক আর একটি গানও প্রকাশিত হয়। "সোনার বাংলা" ১৩১২ সনের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে'ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর (১৩১৩ বঙ্গাব্দের ৩০-এ আশ্বিন) বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সরকারী ঘোষণা কার্যে পরিণত করিয়া বঙ্গভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করা হইল। রাজনৈতিক কৃত্রিম বিভাগকে অস্বীকার করিয়া বাঙালী জাতির সৌভ্রাত্রের বন্ধন দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যে এবং বিভক্ত বঙ্গের মধ্যে ঐক্যের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য পরিকল্পিত হইল রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের জন্য জাতীয় মিলন-যজ্ঞের হোতা রবীন্দ্রনাথ রচনা করিলেন প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত :—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান॥"... ...

এই সঙ্গীতটি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর (১৩১২ বঙ্গাব্দের ২০-এ আশ্বিন) তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে তৎকালের রচিত নিম্নলিখিত তিনটি প্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীতও প্রকাশিত হইয়াছিল :—

(১) "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমন শক্তিমান।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান—
তোমাদের এমন অভিমান।"

(২) "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে॥"

(৩) "আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার ॥
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর,
তোমারে করি নমস্কার ॥"

রবীন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত সঙ্গীতগুলি ব্যতীত আরও কতকগুলি সঙ্গীত সে সময় রচিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে আরও দুইটির উল্লেখ করিতেছি :—

(১) "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে ॥
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়—
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।"

(২) "তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না ॥"

রবীন্দ্রনাথের রচিত নিম্নোদ্ধৃত জাতীয় সঙ্গীতগুলি ১৩১২ সনের আশ্বিন এবং কার্তিক সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল :—

(১) "নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে
যদি পণ ক'রে থাকিস
সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন হবেই হবে।"

(২) "বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি,
বারে বারে হেলিস নে ভাই।
শুধু তুই ভেবে ভেবেই
হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস নে ভাই॥"

(৩) "আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দুবেলা মরার আগে
মরব না ভাই মরব না।"

(৪) "ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা।"

তিন

স্বদেশী অন্দোলনের প্রথম দিকে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গিরিধির এক স্বদেশী সভায়ও উপস্থিত দেখিতে পাই। সেই সভার কার্য সম্পাদনে তিনি সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১-এ সেপ্টেম্বর (১৩১২ বঙ্গাব্দ ৫ই আশ্বিন) তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় পূর্বোক্ত সভার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"দেশী দ্রব্যের সরবরাহ

"গত ১৮ই ভাদ্র তারিখের গিরিধির জনসাধারণ সভার মন্তব্য কার্যে পরিণত করিবার জন্ত যে একটি কার্যসভা গঠিত হইয়াছিল, গত ২৭শে ভাদ্র তাহার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত সভায় যোগদান ও কার্যনিরূপণে সহায়তা করিয়া গিরিধিবাসিগণকে উৎসাহিত ও বাধিত করিয়াছেন। দশ হাজার টাকা মূলধনে এখানে একটি "স্বদেশী গোলা" স্থাপনার্থে সভা উদ্যোগী হইয়াছেন। শীঘ্রই উহার কার্য আরম্ভ হইবে। স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনার্থে উহাতে আপাতত করকচ লবণ, দেশী চিনি, কাপড়ের সূতা ও সম্ভব হইলে দেশী কাপড় ও তাঁত রাখা হইবে।

"বড় সুখের বিষয় গিরিধির প্রায় অধিকাংশ ভদ্রলোক বিলাতী চিনি ও লবণ পরিত্যাগপূর্বক দেশী চিনি, সৈন্ধব ও করকচ ব্যবহার করিতেছেন। কুলিদিগের মধ্যেও দেহাতে (দূরবর্তী গ্রামসমূহে) যাহাতে স্বদেশী চিনি ও করকচ প্রচলন হয় তজ্জন্য চেষ্টা চলিতেছে। স্থানীয় স্কুলের ছাত্রেরা বিলাতী কলম ভাঙিয়া খাক ও বোনের কলম ধরিয়াছে। আমারাও খাক ও বোন ব্যবহার করিতেছি। কুমোর বাড়ি মাটির দোয়াতের ফরমাস গিয়াছে।"......

আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় মাড়োয়ারী বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের বিলাতী কাপড়ের "লক্ষ্মী অর্ডার" (বিজয়া-দশমী দিনের প্রদত্ত অর্ডার) বন্ধ করিবার জন্য কলিকাতায় মাড়োয়ারী ও বাঙালীদিগের কয়েকটি সম্মিলিত সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় আমরা রবীন্দ্রনাথকে সভাপতির আসনে আসীন দেখিতে পাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৮-এ সেপ্টেম্বর (১৩১২ বঙ্গাব্দ ১২ই আশ্বিন) বৃহস্পতিবার তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় এই সম্পর্কে প্রকাশিত একটি বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"মাড়োয়ারীদের "লক্ষ্মী" অর্ডার বন্ধ

"রবিবার চোরবাগানে রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে দ্বিসহস্রাধিক মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালীর সভা হইয়াছিল। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সরল বঙ্গভাষায় এক উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় সকলকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। একজন মাড়োয়ারী মহাজন সুরেন্দ্রবাবুর গলায় মাল্য অর্পণ করেন। সুরেন্দ্রবাবু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে চারিদিকে বিপুল আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হয়। এই সভায় মাড়োয়ারী মহাজনগণ ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহারা এবার ম্যাঞ্চেষ্টারে "লক্ষ্মী অর্ডার" দেওয়া বন্ধ করিবেন। বিজয়া দিন তাঁহারা বিলাতী মালের যে নতুন চুক্তি করেন এবার তাহা রহিত করিবেন। এই সংবাদে সভা মধ্যে বিপুল জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। মাড়োয়ারী তাঁহাদের এই সংকল্পের কথা শীঘ্রই তারযোগে ম্যাঞ্চেষ্টারে জানাইবেন। এই সভায় বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই দিন বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে তারকনাথ প্রামাণিকের বাটীতে আর এক সভা হয়। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি পদে বরিত হন। শ্রীযুক্ত জে, এন, রায়, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।"

বঙ্গবিভাগের সরকারী ঘোষণা কার্যে পরিণত হইল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর। ওই দিবস রাখীবন্ধনের অনুষ্ঠান ব্যতীত অপরাহ্নে কলিকাতার পূর্বাঞ্চলে সার্কুলার রোডে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও মূক-বধির বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী মাঠে এক বিরাট প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি স্বনামখ্যাত ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু। রোগ-শয্যা-শায়ী জননায়ককে কাষ্ঠাসনে বসাইয়া সভাস্থলে বহন করিয়া আনা হইল। সভায় অন্যূন পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সভাপতির লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালী জাতির পক্ষ হইতে সেদিন যে ঘোষণা প্রচার করা হয়, তাহা সভায় পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাহা পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল :—

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত সভায় যোগদান ও কার্যনিরূপণে সহায়তা করিয়া গিরিধিবাসিগণকে উৎসাহিত ও বাধিত করিয়াছেন। দশ হাজার টাকা মূলধনে এখানে একটি "স্বদেশী গোলা" স্থাপনার্থে সভা উদ্যোগী হইয়াছেন। শীঘ্রই উহার কার্য আরম্ভ হইবে। স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনার্থে উহাতে আপাতত করকচ লবণ, দেশী চিনি, কাপড়ের সূতা ও সম্ভব হইলে দেশী কাপড় ও তাঁত রাখা হইবে।

"বড় সুখের বিষয় গিরিধির প্রায় অধিকাংশ ভদ্রলোক বিলাতী চিনি ও লবণ পরিত্যাগপূর্বক দেশী চিনি, সৈন্ধব ও করকচ ব্যবহার করিতেছেন। কুলিদিগের মধ্যেও দেহাতে (দূরবর্তী গ্রামসমূহে) যাহাতে স্বদেশী চিনি ও করকচ প্রচলন হয় তজ্জন্য চেষ্টা চলিতেছে। স্থানীয় স্কুলের ছাত্রেরা বিলাতী কলম ভাঙিয়া খাক ও বোনের কলম ধরিয়াছে। আমারাও খাক ও বোন ব্যবহার করিতেছি। কুমোর বাড়ি মাটির দোয়াতের ফরমাস গিয়াছে।"......

আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় মাড়োয়ারী বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের বিলাতী কাপড়ের "লক্ষ্মী অর্ডার" (বিজয়া-দশমী দিনের প্রদত্ত অর্ডার) বন্ধ করিবার জন্য কলিকাতায় মাড়োয়ারী ও বাঙালীদিগের কয়েকটি সম্মিলিত সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় আমরা রবীন্দ্রনাথকে সভাপতির আসনে আসীন দেখিতে পাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৮-এ সেপ্টেম্বর (১৩১২ বঙ্গাব্দ ১২ই আশ্বিন) বৃহস্পতিবার তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় এই সম্পর্কে প্রকাশিত একটি বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"মাড়োয়ারীদের "লক্ষ্মী" অর্ডার বন্ধ

"রবিবার চোরবাগানে রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে দ্বিসহস্রাধিক মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালীর সভা হইয়াছিল। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সরল বঙ্গভাষায় এক উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় সকলকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। একজন মাড়োয়ারী মহাজন সুরেন্দ্রবাবুর গলায় মাল্য অর্পণ করেন। সুরেন্দ্রবাবু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে চারিদিকে বিপুল আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হয়। এই সভায় মাড়োয়ারী মহাজনগণ ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহারা এবার ম্যাঞ্চেষ্টারে "লক্ষী অর্ডার" দেওয়া বন্ধ করিবেন। বিজয়া দিন তাঁহারা বিলাতী মালের যে নতুন চুক্তি করেন এবার তাহা রহিত করিবেন। এই সংবাদে সভা মধ্যে বিপুল জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। মাড়োয়ারী তাঁহাদের এই সংকল্পের কথা শীঘ্রই তারযোগে ম্যাঞ্চেষ্টারে জানাইবেন। এই সভায় বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই দিন বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে তারকনাথ প্রামাণিকের বাটীতে আর এক সভা হয়। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি পদে বরিত হন। শ্রীযুক্ত জে, এন, রায়, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।"

বঙ্গবিভাগের সরকারী ঘোষণা কার্যে পরিণত হইল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর। ওই দিবস রাখীবন্ধনের অনুষ্ঠান ব্যতীত অপরাহ্নে কলিকাতার পূর্বাঞ্চলে সার্কুলার রোডে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও মূক-বধির বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী মাঠে এক বিরাট প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি স্বনামখ্যাত ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু। রোগ-শয্যা-শায়ী জননায়ককে কাষ্ঠাসনে বসাইয়া সভাস্থলে বহন করিয়া আনা হইল। সভায় অন্যূন পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সভাপতির লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালী জাতির পক্ষ হইতে সেদিন যে ঘোষণা প্রচার করা হয়, তাহা সভায় পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাহা পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল :—

"ঘোষণা

"যেহেতু বাঙালী জাতির সর্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া গভর্নমেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, অতএব আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছে যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমগ্র বাঙালী জাতি, আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব, তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।"

এই উপলক্ষ্যে সেই দিন একটি জাতীয় ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ-সভার অবসানে জনগণ দলে দলে শোভাযাত্রা করিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বাগবাজারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাগবাজারের পশুপতিনাথ বসুর বাড়ির বিরাট ময়দানে প্রায় এক লক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। তথায় আর একটি সভার অধিবেশন হয় এবং সভাস্থলেই জাতীয় ধনভাণ্ডারের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইল। জাতীয় ধনভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহের জন্য পরবর্তী মাসে (কার্তিক) ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে বাংলার প্রধান প্রধান নেতীর স্বাক্ষরিত আবেদন-পত্র প্রচারিত হয়। এই আবেদন-পত্রে রবীন্দ্রনাথেরও স্বাক্ষর ছিল। পূর্বোক্ত আবেদন-পত্র বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ৯ই কার্তিকের (১৩১২ বঙ্গাব্দ) 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা হইতে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

"ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও ধনভাণ্ডার

"বন্দেমাতরম্

"ভগিনীগণ, ভাইদ্বিতীয়ার আর বিলম্ব নাই। ঈশ্বরের কৃপায় এই বৎসর হইতে তোমাদের ভাইদ্বিতীয়ার যজ্ঞ বৃহৎ হইয়া উঠিতেছে।

এবার রাখীসূত্রে সমস্ত বাঙ্গালী ভাই হইয়া মিলিয়াছে। এবারে তোমরা ভাইকে নিমন্ত্রণ করিবার বেলায় দেশ-ভাইকে ভুলিও না। ভগিনি! আমরা তোমাদের দেশ-ভাই, সেই শুভদিনে সমস্ত বঙ্গ-রমণীর কোমল হৃদয়ের কল্যাণ কামনার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিব। সেদিন তোমাদের ঘরের ভাইয়ের অন্নের থালায় যখন অন্ন পরিবেশন করিবে, তাহাদের বস্ত্রের থালায় যখন বস্ত্র সাজাইয়া রাখিবে, তখন হে কল্যাণি মনে রাখিও, ভাই তোমাদের একটি দুইটি নহে—সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া বহু কোটি তোমাদের ভাই; তাহাদের অন্নের স্বচ্ছলতা নাই, তাহাদের শরীর রোগে জীর্ণ, তাহাদের পরিধানে বস্ত্রটুকু সমুদ্রপার হইতে আহরণ করিতে হয়। তাহারা অন্নবান হউক, তেজস্বী হউক, নীরোগ হউক, তাহারা নিজের দুঃখ নিজে মোচন করিবার শক্তিলাভ করুক, এই কামনা করিয়া, ভগিনীগণ সেই দেশ-ভাইদের অন্ন ও বস্ত্রের উদ্দেশ্যে সেদিন যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ দান করিও। তোমাদের কল্যাণ কামনায়, তোমাদের মঙ্গলদানে আমাদের দেশের সমস্ত ভ্রাতৃগণের ললাটের তিলক উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, যমের দ্বারে যথার্থই কাঁটা পড়িবে—এবং যে বিধাতা তোমাদিগকে বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম দিয়া বাঙ্গালীর ভগিনী করিয়াছেন, তিনি প্রসন্ন হইবেন। তাঁহার প্রসাদেই তোমাদের দেশের ও ভাইদের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ঘরের ভাইদেরও যথার্থ মঙ্গল হইবে। ইতি শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীআনন্দ মোহন বসু। শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়। শ্রীনলিনবিহারী সরকার। শ্রীমতিলাল ঘোষ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতে দেশবাসীর দৃষ্টি এমন অনেক জিনিসের উপর পড়িতে লাগিল, যে-সমুদয় ভারতবর্ষে তৎকালে প্রস্তুত হইত না। কলমের হ্যাণ্ডেল এবং নিব সেই শ্রেণীর জিনিস।

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সংকল্প যাহাতে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য বিলাতী হ্যাণ্ডেল ও নিবের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ খাগড়ার কলম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে স্বনামখ্যাত দেশসেবক মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার স্তম্ভে দেশবাসীর নিকট নূতন নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিতেন। হ্যাণ্ডেল ও নিবের সমস্যা সমাধানের জন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পত্রালাপ হয়। বিলাতী দোয়াত-কলম ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য মনোরঞ্জনবাবু 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে তিনি এই সম্পর্কে তাঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র উদ্ধৃত করিয়া দেন। ২৯-এ ভাদ্র (১৩১২ বঙ্গাব্দ) তারিখের 'সঞ্জীবনী'তে রবীন্দ্রনাথের পত্রের উদ্ধৃতিসহ মনোরঞ্জনবাবুর পূর্বোক্ত পত্রখানি প্রকাশিত হয়। নিম্নে উহার প্রয়োজনীয় অংশ প্রদত্ত হইল :—

" . অনেকের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে লোহার কলমেই লেখা ভাল হয়। এই কুসংস্কার দূর করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। রবিবাবু লিখিয়াছেন :—

"যখন সাধ্যমত দেশী জিনিস ব্যবহারের সংকল্প আমার মনকে অধিকার করিল তখন কলম লইয়া মনে খটকা বাধিল। চিরদিন নিবওয়ালা কলমে লেখা অভ্যাস, অথচ নিব এদেশে প্রস্তুত হয় না। মনে করিলাম যদি সংকল্পের খাতিরে লেখা ব্যাপারে আমি অসুবিধা স্বীকার করি তবে সেটা আমার পক্ষে সাধনা স্বরূপ হইবে। এই মনে করিয়া আমি খাগড়ার কলমে লিখিব স্থির করিলাম। খাগড়ার কলম আনাইয়া এক লাইন লিখিতেই দেখিলাম ইহার মধ্যে কৃচ্ছ্র-সাধন লেশমাত্র নাই, বিলাতী কলমে এমন আরামে কোন দিন লিখি নাই। এই কলম কাগজের উপর এমন মোলায়েম ভাবে সরে যে

লিখিয়া সুখ হয়। কাহারো ধারণা আছে ইহাতে ইংরাজী লেখা ভাল হয় না, আমি তো তাহার প্রমাণ পাই নাই। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আমার কলম দর্শন হইতে এই কলমে লিখিয়া এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, সে কলমটি বাজেয়াপ্ত করিয়া তিনি বাড়ী লইয়া গেলেন। এই কলমের আর একটি গুণ এই যে এরূপ দস্যুবৃত্তিতে গৃহস্থ ব্যক্তির বিশেষ ক্লেশের কারণ হয় না—ইহার মূল্য এতই সামান্য। এরূপ কলমের ব্যবহার যে দেশ হইতে প্রায় লোপ পাইল ইহা নিতান্ত অনুকরণের ফলে।'

"মহাজন যেন গতঃ স পন্থা ভাবিয়া জগদীশচন্দ্রের অনুকরণে আমিও রবীন্দ্রনাথের একটি কলম অপহরণ (অবশ্য বলিয়া কহিয়া) করিলাম। খাগের কলমে লিখিয়া বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, বস্তুতঃ এরূপ আরামে অনেক দিন লিখি নাই।"

চার

দ্রুতগতিতে আন্দোলন প্রসারিত হইতেছে দেখিয়া বৈদেশিক সরকার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং জাতীয় অগ্রগতি প্রতিরোধ করিবার জন্য দমন-নীতি অবলম্বন করিলেন। রাজপুরুষদিগের শ্যেন-দৃষ্টি পতিত হইল প্রথমত ছাত্র-সমাজের উপর। উভয় বঙ্গের কর্তৃপক্ষ ছাত্রদলনের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। ছাত্রগণকে রাজনীতিতে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া সরকারী সারকুলার জারি হইল। স্কুল-কলেজের পরিচালকগণের উপরও নানা প্রকার পরওয়ানা জারি হইতে লাগিল। ১৯০৫ সনের শেষ দিকে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন আবার দেশের সর্বত্র সরকারের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইতে লাগিল। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতায় বিভিন্ন কলেজের ছাত্রগণের এক প্রতিবাদ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ১৯০৫ সনের

২৬-এ অক্টোবর (১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৫ই কার্তিক) শুক্রবার অপরাহ্ণে পটলডাঙায় স্বর্গীয় চারুচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে এই ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদিগের প্রতিবাদ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

"স্কুল কলেজের ছাত্রগণের বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্ট সম্প্রতি যে সারকুলার জারি করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টভাবে আমাদিগকে স্বদেশসেবাব্রত হইতে বিরত থাকিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে আমরা কখনই সম্মত হইতে পারি না বা ভবিষ্যতে পারিব না। অতএব আমরা কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে যদি গবর্নমেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি স্বদেশসেবারূপ যে মহাব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহা কখনও পরিত্যাগ করিব না।"

রবীন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণে ছাত্রদিগের সংকল্পের সমর্থন করেন। তাঁহার অভিভাষণের আরম্ভ এইরূপ :—

"এখন বোধহয় উত্তেজনার দ্বারা আপনাদের উত্তপ্ত রক্তকে আর উত্তপ্ত করিবার প্রয়োজন নাই। আজ আপনারা যে সংকল্প গ্রহণ করিলেন কর্তৃপক্ষ হয়ত তাহা অসঙ্গত মনে করিবেন। তাঁহারা খোঁচাও মারেন, আবার জল বাহির হইলে দোষও ধরেন! শুধু কর্তৃপক্ষ নয় আমাদের দেশে অনেক বিবেচক লোক আছেন তাঁহারা মনে করেন যে বিদ্যাভ্যাস ব্যতীত ছাত্রগণের অন্য কোন কার্যে নিযুক্ত হওয়া অন্যায়। অধ্যয়নই যে ছাত্রজীবনের প্রধান কর্তব্য এবং অধ্যয়নে যতই অবহিত হওয়া যায় ততই যে সফলতা লাভের বেশি সম্ভাবনা, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, সকল দেশেই বিশেষ বিশেষ সঙ্কটের সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। তখন

বয়স্কেরা ব্যবসা ছাড়িয়া, যুবকেরা আমোদ প্রমোদ ছাড়িয়া, ছাত্রেরা অধ্যয়ন ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগদান করিয়া থাকেন। সর্বত্রই এইরূপ ঘটে এবং এইরূপ ঘটাই স্বাভাবিক। বর্তমান সময়ে আমরা আমাদের মধ্যে নবজীবনের একটা উত্তেজনা অনুভব করিতেছি।"...

এই অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃপক্ষকে নির্ভীকতার সহিত অথচ সংযত ভাষায় সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন :—

"গবর্নমেণ্ট নিজের বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অপমান করিয়াছেন, তাহা নিজেকেই অপমান করা। ইহার জন্য গবর্নমেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয় বিধ্বস্ত হইলে আমরা দূরে গিয়া নিজেদের বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিব। আমরা ভারি দুর্বল ভারি অসহায় এই ভেবেই আমরা একদিন আমাদিগকে এরূপ অশক্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আর আমরা ভয় পাই না, গবর্নমেণ্ট নিজের জিনিস চূর্ণ করুন, আমরা এই অপমানের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য ভারতের সরস্বতীকে আবার ভারতের নিজের মন্দিরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিব।"...

পূর্বোক্ত সভার প্রস্তাব এবং সভাপতির অভিভাষণের উদ্ধৃতি ১৩১২ সনের ১৬ই কার্তিক (১৯০৫খ্রীঃ ২রা নভেম্বর) তারিখের 'সঞ্জীবনী' হইতে গৃহীত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সভা-সমিতিতে যে বক্তৃতা দিতেন, তাহা প্রায় ক্ষেত্রেই লিখিত ভাষণ। স্বদেশী আন্দোলনের বিবরণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কলিকাতায় কতকগুলি জনসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠের জন্য। এই সকল সভায় জনসমাগম খুব বেশি হইত। স্বদেশী যুগে সর্বপ্রথম তিনি জনসভায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ ("অবস্থা ও ব্যবস্থা") পাঠ করেন ২৫-এ আগস্ট (১৯০৫ খ্রীঃ) কলিকাতা টাউন হলে। মহিলাদিগের জন্য লিখিত তাঁহার "ব্রতধারণ"

নামক প্রবন্ধটি তিনি নিজে কোন সভায় পাঠ করেন নাই। কলিকাতায় একটি মহিলা-সভায় জনৈক মহিলা কর্তৃক ইহা পঠিত হইয়াছিল। "ব্রতধারণ" ১৩১২ সনের ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে:—"কোন স্ত্রীসমাজে জনৈক মহিলা কর্তৃক পঠিত"। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে "আত্মশক্তি" নামক পুস্তকাংশে ইহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:—

"আমাদের দেশেও সম্প্রতি ঈশ্বর দুর্যোগের বেশে যে-সুযোগকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাকে নষ্ট হইতে দিব না বলিয়াই আজ আমাদের সামান্য শক্তিকেও যথাসম্ভব সচেষ্ট করিয়া তুলিয়াছি, যে এক বেদনার উত্তেজনায় আমাদের সকলের চেতনাকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে, আজ সেই বিধাতার প্রেরিত বেদনাদূতকে প্রশ্ন করিয়া আদেশ জানিতে হইবে, কর্তব্য স্থির করিতে হইবে।

"নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার দিন আর আমাদের নাই। বড় দুঃখে আজ আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, আমাদের নিজের সহায় আমরা নিজেরা ছাড়া আর কেহ নাই। এই সহজ কথা যাহারা সহজেই না বুঝে, অপমান তাহাদিগকে বুঝায়, নৈরাশ্য তাহাদিগকে বুঝায়। তাই আজ দায়ে পড়িয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।" আজ আসন্নবিচ্ছেদশঙ্কিত বঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া বাঙালি এ-কথা সুস্পষ্ট বুঝিয়াছে যে, যেখানে স্বার্থের অনৈক্য, যেখানে শ্রদ্ধার অভাব, যেখানে রিক্ত ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আর কোনই বল বা সম্বল নাই, সেখানে ফললাভের আশা কেবল যে বিড়ম্বনা, তাহা নহে, তাহা লাঞ্ছনার একশেষ।"

তারপর রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে, দৈবকৃপায় যখন আজ আমাদের শক্তি সম্বন্ধে ধারণা হইয়াছে, তখন তাহাকে "কাজে খাটাইতে হইবে"।

নতুবা ইহা "তিরোহিত হইয়া যাইবে"। মাতৃভূমির দুর্দশার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি বলিতেছেন :—

"আমরা লড়াই করিতে যাইব না, আমরা ভিক্ষা করিতেও ফিরিব না, কিন্তু আমরা কি এ-কথা বলিতে পারিব না যে, না, আজ নয়,—আমাদের এই অপমানিত উপবাসক্লিষ্ট মাতৃভূমির অন্নের গ্রাস বিদেশের পাতে তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে আমাদের বেশভূষার শখ মিটাইব না? আমরা ভাল হউক, মন্দ হউক, দেশের কাপড় পরিব, দেশের জিনিস ব্যবহার করিব।"

"যুদ্ধের সময় রাজপুত মহিলারা অঙ্গের ভূষণ, মাথার কেশ দান করিয়াছেন"—ভারত-ইতিহাসের সেই গর্ব ও গৌরবের কাহিনী রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বঙ্গনারীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ব্রতগ্রহণের জন্য বঙ্গরমণীদের আহ্বান করিয়া বলিতেছেন :—

"আজ আমাদের বঙ্গদেশ রাজশক্তির নির্দয় আঘাতে বিক্ষত হইয়াছে, আজ বঙ্গরমণীদের ত্যাগের দিন। আজ আমরা ব্রতগ্রহণ করিব। আজ আমরা কোন ক্লেশকে ডরিব না, উপহাসকে অগ্রাহ্য করিব, আজ আমরা পীড়িত জননীর রোগশয্যায় বিলাতের সাজ পরিয়া শৌখিনতা করিতে যাইব না।"

স্বদেশী যুগে পূর্ববঙ্গে অনুষ্ঠিত মহিলা-সভার বিবরণে দেখিতেছি মফস্বলের কোন কোন সভায়ও "ব্রতধারণ" প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম বৎসর কলিকাতায় বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের গৃহে বিজয়া-দশমীর পর-দিবস যে সাধারণ সম্মিলন-সভা আহূত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে "বিজয়া সম্মিলন" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৩১২ সনের কার্তিক সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে। এই অনবদ্য সন্দর্ভের শেষাংশ

উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কবি কহিতেছেন :—

"হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া সম্মিলনের দিন হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলা দেশের সর্বত্র প্রেরণ কর। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত, নদীজাল-জড়িত পূর্ব সীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত কর। যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখাপ্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া একবার বাংলা দেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও—আজ বাংলা দেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচিরুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের বন্দে মাতরং গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক্—একবার করযোড়ে ভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান ॥"...

গোটা গানটি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে।

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগে অনেক রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও অভিভাষণ লিখিয়াছেন এবং কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই জাতীয় রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে তাঁহার সহজ মননশীলতার সুস্পষ্ট পরিচয় তো থাকিতই, তদুপরি কাজের কথা, সুযুক্তি এবং পথের নির্দেশও থাকিত। তাঁহার নিজস্ব লিখন-রীতি ও স্বকীয় বাচন-ভঙ্গীর দরুন শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত স্বভাবতই আকৃষ্ট হইত। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে তাঁহার সমালোচনা যত তীব্র ও তীক্ষ্ণ হউক না কেন, তাহা কখনও সংযম ও শালীনতার সীমা ছাড়াইয়া যাইত না। বিপক্ষকে যেস্থলে তিনি আঘাত করিয়াছেন সে-স্থলেও ঘৃণা, বিদ্বেষ বা হিংসার লেশমাত্র অভিব্যক্তি নাই। এই বিষয়ে কবিগুরুর তুলনা একমাত্র গান্ধীজীর সহিতই হইতে পারে। রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও অভিভাষণ ব্যতীত তাঁহার তৎকালে রচিত এই সম্পর্কীয় সঙ্গীত এবং কবিতাবলীতেও একই ভাবের পরিচয় মিলে। তাঁহার একটি সঙ্গীতে আছে :—

"শাসনে যতই ঘেরো — আছে বল দুর্বলেরও
হও না যতই বড় — আছেন ভগবান ॥
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারি হ'লেই ডুববে তরীখান ॥"

ইহার মধ্য দিয়া কবি স্বৈরতান্ত্রিক শাসককে তাহার শক্তির সীমাবদ্ধতা এবং শক্তির অপপ্রয়োগের পরিণামফল স্মরণ করাইয়া দিয়া সতর্কবাণী শুনাইয়াছেন। আর একটি সঙ্গীতে কবি গাহিয়াছেন :—

"তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু, জেগে আছেন জগৎ-প্রভু—
ওরা ধর্ম যতই দলবে ততই ধূলায় ধ্বজা লুটবে,
ওদের ধূলায় ধ্বজা লুটবে ॥"

রাজরোষের ভয় উপেক্ষা করিয়া মুক্তি-তীর্থের যাত্রীদল নিঃশঙ্ক-চিত্তে

যেন অগ্রসর হয়, সেই অনুপ্রাণনা যোগাইয়াছেন কবি তাঁহার বাণীর মধ্য দিয়া। কিন্তু সঙ্গীতের পূর্বোক্ত চরণগুলির মধ্যে কোথায়ও ঘৃণা, বিদ্বেষ, উষ্মা বা উত্তাপের প্রকাশ নাই। এই শ্রেণীর একটি প্রসিদ্ধ কবিতা হইতেও নিম্নে উদ্ধৃতি দিতেছি। "নমস্কার" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নির্যাতিত লোকপ্রিয় দেশনায়ক অরবিন্দকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। এই অনুপম কবিতা রচিত হইয়াছিল ১৩১৪ সনের ৭ই ভাদ্র—ইংরেজী ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে। তখন স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে বিদেশী রাজার দমন-নীতির প্রয়োগ প্রচণ্ড-বেগে চলিতেছিল। দেশবাসীর মধ্যে উত্তেজনা এবং বিক্ষোভও ছিল প্রবল ও প্রচুর। এইরূপ অবস্থার মধ্যে উত্তপ্ত আবহাওয়ায় রচিত কবিতায় কোথাও সংযমের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। অথচ ইহাতে অত্যাচারীর প্রতি নির্ভীক সাবধান-বাণী রহিয়াছে এবং মুক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে রাজদণ্ডের ব্যর্থতার কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কবি কহিতেছেন :—

"দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণ-বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।...

*　　　　　*

"বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,—
মহাতীর্থযাত্রীর সংগীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর।"...

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-যুগে লিখিত ও জনসভায় পঠিত আরও কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছি। বরিশালে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন বলপূর্বক ভাঙিয়া দেওয়ার পর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮-এ মে (১৩১৩ সনের ১৫ই বৈশাখ) কলিকাতায় বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়ির প্রাঙ্গণে এক বিরাট প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হয়। সভায় অন্যূন পনেরো হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। 'ইণ্ডিয়ান মিরার'-এর সম্পাদক স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বরিশালে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী, ডাক্তার এম. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার বসু, ব্যারিস্টার বি. চক্রবর্তী প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন।

সভার নির্ধারিত কার্যের অবসানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "দেশনায়ক" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। পরবর্তী মাসের (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) 'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে তাঁহার "সমূহ" গ্রন্থে প্রবন্ধটি গ্রথিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ 'পিটিশন বা প্রোটেস্ট'-এর পথ ছাড়িবার জন্য দেশনায়কদের বলিয়াছেন এবং নায়কের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন। "যাঁহারা পিটিশন বা প্রোটেস্ট প্রণয় বা কলহ করিবার জন্য রাজবাড়ির বাঁধা রাস্তাটাতেই ঘন ঘন দৌড়াদৌড়ি করাকেই দেশের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করেন, আমি সে দলের লোক নই, সে কথা পুনশ্চ বলা বাহুল্য।"—এইরূপ অভিমত তিনি একাধিক বার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। নায়কের কর্তব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :—

"...নায়কের কর্তব্য চালনা করা—ভ্রমের পথেই হউক, আর ভ্রম সংশোধনের পথেই হউক। অভ্রান্ত তত্ত্বদর্শীর জন্য দেশকে অপেক্ষা করিয়া

বসিয়া থাকিতে বলা কোনো কাজের কথা নহে। দেশকে চলিতে হইবে ; কারণ চলা স্বাস্থ্যকর, বলকর। এতদিন আমরা যে পোলিটিক্যাল অ্যাজিটেশনের পথে চলিয়াছি, অন্য ফললাভ যতই সামান্য হউক, নিশ্চয়ই বললাভ করিয়াছি,—নিশ্চয়ই ইহাতে আমাদের চিত্ত সজাগ হইয়াছে, আমাদের জড়ত্ব মোচন হইয়াছে। কখনই উপদেশের দ্বারা ভ্রমের মূল উৎপাটিত হয় না, তাহা বারংবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। ভোগের দ্বারাই কর্মক্ষয় হয়, তেমনি ভ্রম করিতে দিলেই যথার্থ-ভাবে ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে, নহিলে তাহার জড় মরিতে পারে না। ভুল করাকে আমি ভয় করি না, ভুলের আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাকেই ভয় করি। দেশের বিধাতা দেশকে বারংবার অপথে ফেলিয়াই তাহাকে পথ চিনাইয়া দেন—গুরুমহাশয় পাঠশালায় বসিয়া তাহাকে পথ চিনাইতে পারেন না। রাজপথে ছুটাছুটি করিয়া যতটা ফল পাওয়া যায় সেই সময়টা নিজের মাঠ চষিয়া অনেক বেশি ফল-লাভের সম্ভাবনা, এই কথাটা সম্পূর্ণ বুঝিবার জন্য বহু দিনের বিফলতা গুরুর মত কাজ করে। সেই গুরুর শিক্ষা যখন হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন যাহারা পথে ছুটিয়াছিল, তাহারাই মাঠে চলিবে। আর যাহারা ঘরে পড়িয়া থাকে, তাহারা বাটেরও নয়, মাঠেরও নয়, তাহারা অবিচলিত প্রাজ্ঞতার ভড়ং করিলেও, সকল আশার, সকল সদ্গতির বাহিরে।

"অতএব দেশকে চলিতে হইবে। চলিলেই তাহার সকল শক্তি আপনি জাগিবে, আপনি খেলিবে। কিন্তু রীতিমত চলিতে গেলে চালক চাই। পথের সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদিগকে দল বাঁধিতে হইবে, স্বতন্ত্র পাথেয়গুলিকে একত্র করিতে হইবে, এক জনের বাধ্যতা স্বীকার করিয়া দৃঢ় নিয়মের অধীনে নিজেদের মত-বিভিন্নতাকে যথাসম্ভব সংযত করিতে হইবে, নতুবা আমাদের সার্থকতা

অন্বেষণের এই মহাযাত্রা দীর্ঘকাল কেবল ছুটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি, ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকিতেই নষ্ট হইতে থাকিবে।

"...একজনকে মানিয়া আমরা যথার্থভাবে আপনাদিগকে মানিব। একজনের মধ্যে আমাদের সকলকে স্বীকার করিব। একজনের দক্ষিণ হস্তকে আমাদের সকলের শক্তিতে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব। আমাদের সকলের চিন্তা তাঁহার মন্ত্রণাগারে মিলিত হইবে এবং তাঁহার আদেশ আমাদের সকলের আদেশরূপে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।"

জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দুইটি প্রবন্ধ "শিক্ষা সমস্যা" এবং "জাতীয় বিদ্যালয়" ১৩১৩ সনের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' যথাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করিয়াছেন কলিকাতায় ওভারটুন হলে ২৩-এ জ্যৈষ্ঠ তারিখের আহূত জনসভায়। দ্বিতীয় প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে ২৯-এ শ্রাবণ কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রারম্ভিক উৎসবে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ। জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার ভার জাতির নিজ হস্তে গ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কে সুবিবেচিত আলোচনা এই দুইটি প্রবন্ধে রহিয়াছে। "শিক্ষা সমস্যা" প্রবন্ধে একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন :—

"...অতএব আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

"যদি সম্ভব হয়, তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক ;—এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য

সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ-ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে, কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

"অনুকূল ঋতুতে বড় বড় ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার আকাশে তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, সঙ্গীতচর্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।"

"জাতীয় বিদ্যালয়" প্রবন্ধটি হইতেও নিম্নে উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"জগতের মধ্যে ভারতবাসীর যে একটি বিশেষ অধিকার আছে, সেই অধিকারের জন্য আজ জাতীয় বিদ্যালয় আমাদিগকে প্রস্তুত করিবে —আজ এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা এই নূতন বিদ্যাভবনের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম। সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুলকলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম, তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে।...

"...আজ জাতীয় বিদ্যালয় মঙ্গলের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে মন, বাক্য, এবং কর্মের পূর্ণ সম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার নিকটে আমাদিগকে পূজা আহরণ করিতেই হইবে। এইরূপ পূজার বিষয় প্রতিষ্ঠার দ্বারাই জাতি বড় হইয়া উঠে। অতএব জাতীয় বিদ্যালয় যে কেবল ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া কল্যাণ সাধন করিবে, তাহা নহে—কিন্তু দেশের মাঝখানে একটি পূজার যোগ্য প্রকৃত মহৎ ব্যাপারের উপস্থিতিই লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে আমাদিগকে মহত্ত্বের

দিকে লইয়া যাইবে। এই কথা মনে রাখিয়া আজ আমরা ইহাকে আবাহন ও অভিবাদন করিব। এই কথা মনে রাখিয়া আমরা ইহা রক্ষা করিব ও মান্য করিব। ইহাকে রক্ষা করা আত্মরক্ষা, ইহাকে মান্য করাই আত্মসম্মান।"

ছয়

"ততঃ কিম্" নামক রবীন্দ্রনাথের আর একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ পঠিত হয় ১৩১৩ সনের কার্তিক মাসে "ওভারটুন হলে আহূত আলোচনা সমিতির বিশেষ অধিবেশনে"। পরবর্তী মাসের (অগ্রহায়ণ সংখ্যা) 'বঙ্গদর্শনে' ইহা প্রকাশিত হয়। স্বদেশী যুগে লিখিত ও পঠিত তাঁহার "সাহিত্য সম্মিলন" শীর্ষক সন্দর্ভটিরও উল্লেখ এ ক্ষেত্রে করিতেছি। ইহাকে নির্বিরোধে রাজনৈতিক রচনার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, রাজনীতি বলিতে রবীন্দ্রনাথ পিটিশন, প্রোটেস্ট এবং অ্যাজিটেশন বুঝিতেন না। তাঁহার রাজনীতির ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, তাহা ছিল বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত। রাজনীতি বলিতে তিনি বুঝিতেন,—জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি, স্বদেশ ও স্বজাতির অকৃত্রিম সেবা, বিদেশী সভ্যতার অবাঞ্ছনীয় প্রভাব হইতে স্বদেশী বেশ-ভূষা, স্বদেশী ভাষা ও সাহিত্য এবং স্বদেশী সংস্কৃতিকে রক্ষা করা, আত্মশক্তির উদ্বোধন দ্বারা জাতিকে আত্মনির্ভর করিয়া তোলা, বিভ্রান্ত ও বিপথগামী দেশবাসীর বহির্মুখ গতিকে অন্তর্মুখী করা, আধুনিক নাগরিক জীবনের মোহ হইতে জাতির মনকে মুক্ত করিয়া প্রাচীন ভারতের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান পল্লী-জীবনের প্রতি আকর্ষণ করা।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (১৩১৩ বঙ্গাব্দ) কলিকাতায় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশন হইয়াছিল। তৎকালে কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে নিখিল ভারতীয়

শিল্প-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইত। কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশন কালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শিল্প-প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে একটি সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার "সাহিত্য সম্মিলন" প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ওই বৎসরই বরিশালে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে একই মণ্ডপে সর্বপ্রথম প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু বৈদেশিক রাজার শাসকগণ রাষ্ট্রীয় সম্মিলন বলপ্রয়োগে ভাঙিয়া দেওয়ায় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনও সম্ভবপর হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া বরিশালে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্বোক্ত প্রবন্ধের প্রারম্ভে তিনি সংক্ষেপে সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"...তারপর হঠাৎ অকালে ঝড় উঠিয়া সেই সভাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল তাহাও সকলে জানেন। সংসারে শুভকর্ম সকল সময়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় না। বিঘ্নই অনেক সময়ে শুভকর্মের কর্মকে রোধ করিয়া শুভকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে।...

"কিন্তু কলিকাতা বড়োই কঠিন স্থান।· এ তো বরিশাল নয়। এ যে রাজবাড়ীর শানবাঁধানো আঙিনা। এখানে কেবল কাজ, কৌতুক ও কৌতূহল, আনাগোনা এবং উত্তেজনা। এখানে হৃদয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইবে কোথায়? জিজ্ঞাসা করি, এখানে হৃদয় দিয়া মিলনসভাকে আহ্বান করিতেছে কে? এ সভার প্রয়োজন কি কেহ বেদনার সহিত নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়াছে? এখানে ইহা নানা আয়োজনের মধ্যে একটি মাত্র, সর্বদাই নানা প্রকারে জনতা-মহারাজের মন ভুলাইয়া রাখিবার এক শত অনাবশ্যক ব্যাপারের মধ্যে এটি এক শত এক।

"জনতা-মহারাজকে আমিও যথেষ্ট সম্মান করি, কিন্তু কিঞ্চিৎ দূর হইতে করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার সেবক-পরিচারকের অভাব নাই।

আমিও মাঝে মাঝে তাঁহার দ্বারে হাজিরা দিয়াছি, হাততালির বেতনও আদায় করিয়া লইয়াছি, কিন্তু সত্য কথাই বলিতেছি, সে বেতনে চিরদিন পেট ভরে না ; এখন ছুটি লইবার সময় হইয়াছে।"

তারপর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, —

"বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ যে হঠাৎ বন্যার মতো একরাত্রে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে। আসল কথা এই যে, সমস্ত বাংলা দেশে একটা মিলনের দক্ষিণ-হাওয়া দিয়াছে।

"...স্বদেশের মাঝখান হইতে মিলনের টান পড়িতেই মাতৃকক্ষের ছোটোবড়ো সমস্ত দরজাজানালা খুলিয়া গেছে। কে আমাদিগকে চলিতে বলিতেছে। উদ্দেশ্য কী ? উদ্দেশ্য তো পরিষ্কার করিয়া কিছুই বলিতে পারি না। যদি বানাইয়া বলিতে বল, তবে বড়ো বড়ো নামওয়ালা উদ্দেশ্য বানাইয়া দেওয়া কিছু শক্ত নয়। কুঁড়ি যে কেন বাধা ছিঁড়িয়া ফুল হইয়া ফুটিতে চায়, তাহা ফুলের বিধাতাই নিশ্চয় জানেন, কিন্তু দক্ষিণে হাওয়া দিলে সাধ্য কি সে চুপ করিয়া থাকে। তাহার কোনো কৈফিয়ত নাই, তাহার একমাত্র বলিবার কথা, আমি থাকিতে পারিলাম না। বাংলা দেশের এমনি একটা খ্যাপা অবস্থায় আজ রাজনীতিকের দল তাঁহাদের গড়ের বাদ্য বাজাইয়া চলিয়াছেন, বিদ্যার্থীর দলও কলরবে যাত্রাপথ মুখরিত করিয়াছেন, ছাত্রগণও স্বদেশী ব্যবসায়ের রথের রশি ধরিয়া উঁচুনিচু পথের কাঁকরগুলা দলিয়া পা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন— আর আমরা সাহিত্যিকের দলই কি চুপ করিয়া থাকিতে পারি ? যজ্ঞে কি আমাদেরই নিমন্ত্রণ নাই ?

"সে কী কথা ? নাই তো কী ? এ-যজ্ঞে আমরাই সকলের বেশি মর্যাদা দাবি করিব। দেশলক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্ত হইতে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা আমরাই সকলের আগে আদায় করিয়া ছাড়িব।"...

অতঃপর তিনি স্বদেশের মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে এবং বাঙালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে বাংলা সাহিত্যের দানের উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্যের উন্নতি সাধন ব্যতীত যে স্বদেশের প্রগতি সম্ভবপর নহে এবং স্বদেশ ও সাহিত্যের মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহারও আলোচনা প্রবন্ধে করা হইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" মহামন্ত্রটি যে বঙ্গ-সাহিত্যেরই দান, তাহা তিনি স্বদেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—

"আমরা বিদেশী ভাষায় পরের দরবারে এতকাল যে ভিক্ষা কুড়াইলাম, তাহাতে লাভের অপেক্ষা লাঞ্ছনার বোঝাই বেশি জমিল, আর দেশী ভাষায় স্বদেশীর হৃদয়-দরবারে যেমনি হাত পাতিলাম, অমনি মুহূর্তের মধ্যেই মাতা যে আমাদের মুঠা ভরিয়া দিলেন। সেইজন্য আমি বিবেচনা করি, অদ্যকার বাংলা ভাষার দল যদি গদিটা দখল করিয়া বসে, তবে আর সকলকে সেটুকু স্বীকার করিয়া যাইতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে, এই মিলনোৎসবের "বন্দে মাতরং" মহামন্ত্রটি বঙ্গসাহিত্যেরই দান।"

পূর্বোক্ত সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল ১৩১৩ সনের ৪ঠা ও ৫ই মাঘ তারিখে। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্য সম্মিলন" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছেন। ১০ই মাঘের (১৯০৭ সনের ২৪-এ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার) 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় "শিল্পপ্রদর্শনীতে সারস্বত সম্মিলন" শীর্ষক সংবাদে সেই অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই বিবরণের সম্পূর্ণ অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"শিল্পপ্রদর্শনীতে সারস্বত সম্মিলন

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং শিল্পপ্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষগণের উদ্যোগে গত শুক্র ও শনিবার প্রদর্শনীর মধ্যে এক সারস্বত সম্মিলনের অনুষ্ঠান

হয়। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য, শ্রীযুক্ত গোখলে, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন, শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, খাঁ বাহাদুর মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্রগণ এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই দুই দিন কণ্ঠ সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, কৌতুকাবৃত্তি, নাটকাভিনয়, তরবার ক্রীড়া, ব্যাণ্ড, বায়স্কোপ, সাহিত্যালোচনা প্রভৃতি দ্বারা সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের চিত্ত-বিনোদন করা হইয়াছিল। শনিবার অপরাহ্লে যে সাহিত্য সম্মিলন হয়, উহার প্রারম্ভে মহাকালী পাঠশালার বালিকাগণ একটি সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করেন। তদনন্তর কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুললিত কণ্ঠে জাতীয় সাহিত্য ও ঐক্য সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভাবের গভীরতায়, সর্বৈশ্বর্যময়ী ভাষার মাধুর্য্যে এবং বর্তমান অবস্থার সুনিপুণ বিশ্লেষণে প্রবন্ধটি পরম রমণীয় হইয়াছিল। তাঁহার অমৃতনিস্যন্দিনী বক্তৃতা কেবল উপভোগের যোগ্য, সার সঙ্কলন করিতে গেলে তাহার সকল সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায়। আমরা সে বিফল চেষ্টা করিব না, কেবল দুই চারি কথায় মূল বিষয়টি প্রকাশ করিব। তিনি বলেন যে সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে ঐক্যবন্ধন করা এই সম্মিলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যসেবিগণ সমষ্টিভাবে কখনও সাহিত্যসেবা করেন না। কিন্তু এই যে ঐক্যবন্ধনের আকাঙ্ক্ষা, এটি বর্তমান কালের একটি বিশেষ লক্ষণ। বিচিত্র আকারে আমাদের মধ্যে উহা আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মাতৃভূমির সেবা করিতে হইলে প্রথমে তাহার সহিত

প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়া আবশ্যক; প্রথমে জ্ঞান, তারপরে প্রেম ও কর্ম্ম। আজ বাংলা দেশে দুই বিভিন্ন যুগের উদয়াস্ত সময়ে প্রত্যেক ছাত্রের কর্ত্তব্য দেশের সাহিত্য, ধর্ম, শিল্প, আচার ব্যবহার প্রভৃতির সহিত পরিচয় সাধন করা এবং 'সাহিত্য পরিষদে'র অবলম্বিত প্রণালী অনুসারে তাহা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা। এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে স্বদেশপ্রেম কখনও দৃঢ়মূল হইবে না। তৎপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত মত বাঙ্গলা ভাষায় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। আমরা নিম্নে যথাসাধ্য সুরেন্দ্র বাবুর ভাষায় তাঁহার বক্তৃতার মর্ম প্রকাশ করিলাম।

সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা

"সভ্যমহোদয়গণ, একটা কথা আছে 'ঢাকের কাছে ট্যামটেমি'। আমার বন্ধুপ্রবর রবীন্দ্র বাবুর কাছে আমিও তাই। রবীন্দ্র বাবুর ঢাকের মত চেহারা আমি এ কথা বলছি না, তাঁহার বক্তৃতার কথা বলছি। রবীন্দ্র বাবুর পরে বক্তৃতা করতে দাঁড়ান ভীষণ বেয়াদবি। কিন্তু এর জন্য আমি মোটেই দায়ী নই। আমি এই platformএ এই মঞ্চে দুই চারিজন ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা আমাকে জোর ক'রে এনে উপস্থিত করেছেন। এ বক্তৃতার দায়িত্ব তাঁদেরই ওপর। আমি সাহিত্যসেবক নই। মাতৃভাষার সেবা করলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয় আমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। আমি আজীবন বিদেশী ভাষা ব্যবহার করেছি, বিদেশী গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন নিবেদন করেছি, বিদেশী রাজার সঙ্গে বাকবিতণ্ডা ক'রে বেড়িয়েছি। আর কতদিন যে এ করতে হবে তা জানি না। কিন্তু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে—আর তা যদি না করি তবে আমি বাতুল—এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, দেশের সাহিত্যই দেশের গৌরব, দেশের প্রাণ, দেশের

মান, দেশের আশা ভরসা স্থল। যখন দেশের লোকের মনে কোন নতুন ভাবের আবির্ভাব হয় কিংবা দেশের মধ্যে কোন নতুন আবেগ উপস্থিত হয় তখন জাতীয় সাহিত্যে তা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সাহিত্যে সেই ভাব সেই আবেগ জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর অনেক প্রমাণ আছে। আমাদের দেশে রাজা রামমোহন রায় যখন ধর্ম প্রচার করেন তখন আমাদের সাহিত্য নতুন প্রাণে অনুপ্রাণিত হয়। আবার যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবার দুঃখে কাতর হইয়া বিধবা বিবাহের আন্দোলন উপস্থিত করেন তখন তাহাও আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। আবার দেখুন এই স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের সাহিত্যের কি উপকার হচ্ছে। তাই বলছিলুম, "জাতীয় সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব স্বরূপ।"

"বাংলা সাহিত্য আমাদের নিজেদের জিনিস—উহা পরের নয়। কালের পরিবর্তন হবে, রাজার পর রাজা আসবে, সমাজ বদলে যাবে, কিন্তু আমাদের এই সাহিত্যের নাশ নাই, হ্রাস নাই, ধ্বংস নাই। এই সাহিত্যের মধ্যে আমাদের গৃহলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত আছেন। এক মনে, এক প্রাণে, এক চিত্তে যদি আমরা ইঁহার পূজা করি তবে ইনি পুনরুজ্জীবিতা হবেনই হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

"আমি কাল এই প্রদর্শনীতে ভ্রমণ করছিলুম। আমার সঙ্গে একটি বন্ধু ছিলেন। তিনি এই প্রদর্শনীর একজন সহকারী সম্পাদক। তিনি আমায় গুটিকতক জিনিস দেখালেন। দেখে মনে বড় আহ্লাদ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে অনেক নতুন ভাবের উদয় হ'ল। ভাবলুম—আমরা কি ছিলুম—কি হলুম। আরও ভাবলুম—অতীতে যদি আমরা এত বড় ছিলুম, তবে ভবিষ্যতে কেন হব না? আমাদের আত্মমর্যাদা, আমাদের গৌরব, আমাদের শক্তি আবার কেন ফিরে আসবে না? ব্রাহ্মণের বক্ষে পূর্বের সেই অগ্নি, সেই তেজ, সেই ঋষি তপস্বীর

হোমানল আবার জ্বলে উঠবে। বুঝলাম আর্যজাতির সেই গৌরব আবার ফিরে আসবে।

"আমি পূর্বেই বলেছি আমি সাহিত্যসেবক নই। আমি রাজনৈতিক স্রোতে নিমগ্ন রয়েছি। কিন্তু আমি বেশ জানি, সাহিত্য রাজনৈতিক আন্দোলনের ডান হাত, জাতীয় জীবনের প্রধান ভিত্তি। তাই আমি আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং এই সভার উদ্দেশ্যের সহিত সমবেদনা এবং সহানুভূতি প্রকাশ কচ্ছি।

"আমার আর কিছু বক্তব্য নাই। আপনারা রবীন্দ্র বাবুকে তাঁর বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করুন—যিনি আমাদের সাহিত্যগগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর চেয়ে উজ্জ্বলতর নক্ষত্র আর নাই। গদ্যে পদ্যে তাঁহার অসীম প্রতিভা। শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, রাজনীতিক্ষেত্রেও তিনি আমাদের একজন প্রধান অধিনায়ক, ইহা তিনি স্বীকার করুন আর নাই করুন। শিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁহার উদ্যম অপরিসীম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন এবং আমাদের সমাজে তিনি যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন চিরদিন সেই স্থান অধিকার ক'রে থাকুন।"

রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় নেতা না হইলেও স্বদেশী যুগে তাঁহার জনপ্রিয়তা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে পুরোবর্তী দেশ-নায়কগণের ন্যায় মর্যাদা ও সম্মান পাইয়াছিলেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের তৃতীয় বৎসরে তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর পাবনা-অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচন করে। তৎকালে তিনি যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা যে-কোন প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় নেতার অভিভাষণের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহার অভিভাষণ যে রাজনীতিক্ষেত্রে বিবদমান বিভিন্ন দলের নিকট সমাদর পাইয়াছিল, তাহাতে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। বাংলার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের কোন সভাপতি ইতিপূর্বে

মাতৃভাষায় অভিভাষণ লিখিয়া পাঠ করেন নাই। সেই অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ গ্রাম-সংগঠনের আবশ্যকতার প্রতি স্বদেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করেন। তৎপূর্বেও একাধিক প্রবন্ধে পল্লী-উন্নয়নের কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। দেশের লোককে গ্রামাভিমুখী না করিতে পারিলে স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণসাধন যে সম্ভবপর হইবে না, তাহা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কোন ভারতীয় নেতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন কি না জানি না। এই সম্পর্কে অভিভাষণে বলিয়াছেন :—

"…দেশের সমস্ত গ্রাম নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে, সেখানে কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিশের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।"

এই কল্পনাকে রূপায়িত করিবার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অত্যন্ত বলবতী ছিল। উত্তরকালে তিনি বোলপুরে বাংলার সুদূর পল্লীর ছায়া-শীতল শান্ত পরিবেশের মধ্যে "শ্রীনিকেতন" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের গ্রামোন্নয়ন ও কুটীর-শিল্প পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা সুবিদিত। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত "বিশ্বভারতী"ও তাঁহার সংগঠনী প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন। রবীন্দ্র-প্রতিভা সর্বতোমুখী।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

এক

"১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর (১৩১৩ বঙ্গাব্দের ৩০শে আশ্বিন) বঙ্গ-বিভাগের সরকারী ঘোষণা কার্যে পরিণত করিয়া বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হইল। বিভক্ত বঙ্গের মধ্যে ঐক্যের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য এবং রাজনীতিক কৃত্রিম বিভাগ অস্বীকার করিয়া বাঙালী জাতির সৌভ্রাত্রের বন্ধন অটুট রাখিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হইল রাখী-বন্ধন অনুষ্ঠান। নেতৃমণ্ডলীর নির্দেশে বাংলা দেশের নগরে ও গ্রামে অরন্ধন ও রাখী বন্ধন অনুষ্ঠান পালিত হইল। বাঙালীরা দলে দলে শোভাযাত্রা করিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া স্নানান্তে পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিল। রাখী-বন্ধনের জন্য জাতীয় মিলন-যজ্ঞের হোতা রবীন্দ্রনাথ রচনা করিলেন প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান ॥"

* * * * *

"খণ্ডিত বাংলার মিলনের আদর্শ এবং সমগ্র বাঙালী জাতির মধ্যে ঐক্য সাধনের মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া রাখী-বন্ধন অনুষ্ঠান ও ফেডারেশন হল নির্মাণের পরিকল্পনা রচিত হয়। ইহাতে ভাবপ্রবণ কল্পনাকুশল বাঙালীর কবি-চিত্তের পরিচয় মিলে।"

এই উদ্ধৃতি দিয়াছি আমার রচিত 'শহীদ যুগল' (প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের জীবন-চরিত ও সমসাময়িক রাজনীতিক ইতিহাস) নামক গ্রন্থের "স্বদেশী আন্দোলন" অধ্যায় হইতে। রাখী-বন্ধনের পরিকল্পনায় "ভাবপ্রবণ কল্পনাকুশল বাঙালীর কবি-চিত্তের পরিচয় মিলে"—বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছি, তাহা লিখিবার পূর্বে আমার মনে হইয়াছিল, রাখী-বন্ধন

অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত। ধারণা বা অনুমান ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কারে কিংবা সত্য নির্ধারণে স্থলবিশেষে সহায়ক বটে ; কিন্তু ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই ঐতিহাসিক বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এই কারণে আমি উহা রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত বলিয়া লিখিতে পারি নাই। বস্তুতপক্ষে রাখী-বন্ধন অনুষ্ঠান যে রবীন্দ্রনাথেরই পরিকল্পনা, তৎসম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি। স্বদেশী যুগের দেশবিশ্রুত নির্বাসিত নেতা 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক স্বর্গত কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'আত্মচরিত' হইতে সেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ক্রমে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অঙ্গচ্ছেদের দিন যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, বঙ্গদেশকে অখণ্ড রাখিবার সংকল্প ততই দৃঢ় হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রস্তাব করিলেন, গবর্নমেণ্ট বাঙ্গলা দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলা, বাঙ্গালীর প্রীতির দুশ্ছেদ্য সূত্রে আরও নিকটবর্তী হইবে। তাহার চিহ্নস্বরূপ বাঙ্গালী নরনারী ৩০শে আশ্বিন রাখী-বন্ধন করিবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রাখী-বন্ধন ব্যতীত এই নির্ধারণ করিলেন, শোকচিহ্ন স্বরূপ ৩০শে আশ্বিন শিশু ও রোগী ব্যতীত, আর কেহই অন্নজল গ্রহণ করিবেন না এবং সকলেই সেদিন খালি পায়ে থাকিবেন। কোন বাঙ্গালীর ঘরে চুলা জ্বলিবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ থাকিবে, রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী বা গরুর গাড়ী চলিবে না। দোকানপাট ও বাজার বন্ধ থাকিবে। সূর্যোদয়ের পূর্ব হইতে কলিকাতার উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত স্থানে যুবকগণ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত করিতে করিতে গঙ্গার ধারে সমবেত হইয়া তথায় স্নান করিয়া বিডন স্কোয়ার ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সেণ্ট্রাল কলেজে সমবেত হইবে। প্রথমতঃ সেখানে রাখীবন্ধন

ও বঙ্গচ্ছেদজনিত প্রাণের খেদ ও সঙ্কল্প প্রকাশ করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ আপার সার্কুলার রোডে অপরাহ্নকালে এক বিরাট সভা হইবে। গবর্নমেণ্ট পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বাঙ্গালীদিগকে যে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই, তাহার চিহ্নস্বরূপ ঐ সভাস্থল ক্রয় করা হইবে এবং তদুপরি অখণ্ড বঙ্গভবন নির্মাণ করা হইবে। তৃতীয়তঃ, বাগবাজার ষ্ট্রীটে পশুপতিবাবুর বাড়ীতে সন্ধ্যাকালে আর এক সভা হইবে। সে স্থলে স্বদেশী বস্ত্র প্রস্তুতের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করা হইবে।"

স্বদেশী যুগের মধ্যপর্বে যখন বিদেশী সরকার নিরঙ্কুশ দমন-নীতি প্রয়োগ করিয়া বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন বাংলার দেশসেবকগণকে রাজপুরুষদের হস্তে নানাভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। বিদ্যালয় হইতে ছাত্র বহিষ্কৃত হইল, শিক্ষক কর্মচ্যুত হইলেন, বিলাতী দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং করার জন্য আন্দোলনের স্বয়ংসেবকগণ গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে আটক হইলেন,—ইহাদের কেহ কেহ অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হইলেন।

স্বদেশের সেবা করিতে যাইয়া যাঁহারা নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন 'হিতবাদী'-সম্পাদক স্বর্গত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৩১২ সালের ২রা ফাল্গুন) তারিখে কলিকাতা "গ্রান্ড্ থিয়েটার" নামক রঙ্গালয়ে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন 'ইণ্ডিয়ান মিরার'-পত্রের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন; লাঞ্ছিত স্বদেশসেবকগণকে রৌপ্যপদক, বন্দে মাতরম্-অঙ্কিত রৌপ্য লকেট এবং প্রশস্তি-পত্র বিতরণ করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীপুর সেবক সম্প্রদায়ের গায়কগণ কর্তৃক "বন্দে মাতরম্" গীত হয়। সুরেন্দ্রনাথ এক হৃদয়স্পর্শী ভাষণে লাঞ্ছিত দেশসেবকগণকে অভিনন্দিত করেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় অনুপস্থিত

জননায়কগণের এতদুপলক্ষ্যে লিখিত পত্রাবলী সভায় পাঠ করিয়া শুনান। রবীন্দ্রনাথের লিখিত চিঠিখানি শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছিল। চিঠিখানি এই :—

"স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন

"বাংলা দেশের বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদণ্ড যাঁহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলাদেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইয়াছেন, তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। রাজচক্রের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্য রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে। যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা জগৎসমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। অদ্য কঠিন ব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধি স্বরূপ যে কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্তৃক বিশেষরূপে নির্যাতিত হইয়াছেন, তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমা সঞ্চার না করিয়া বার বার স্বর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে 'বন্দে মাতরম্'। ২রা ফাল্গুন ১৩১২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

এই পত্রখানি রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' নামক মাসিক পত্রের ১৩১২ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত সভার বিশদ বিবরণ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত তৎকালের বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় পর দিনের অর্থাৎ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৩১২ সালের ৩রা ফাল্গুন) তারিখের সংখ্যায় নিম্নলিখিত শিরনামায় প্রকাশিত হইয়াছে :—

'The Swadeshi Martyrs." "Public appreciation of their services" "Monster meeting at Grand Theatre."

সভার উদ্দেশ্যবর্ণনায় আছে :—

"To show sympathy with the sufferers and to give expression to the public appreciation of their services in furtherance of the Swadeshi movement..."

অন্যান্য সংবাদপত্রেও সভার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছিলেন তাঁহার স্বদেশবাসী এবং স্বজাতিকে সত্য ন্যায় ও বীর্যের পথে পরিচালিত করিতে। নব-জাগৃতির উন্মাদনায় তাঁহার স্বদেশবাসীগণ যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিপথগামী না হয়, ইহাই ছিল তাঁহার ঐকান্তিক কামনা। সেই কামনা তাঁহার স্বদেশী যুগের নানা রচনা ও ভাষণের মধ্য দিয়া সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। স্বদেশ-সেবকগণের মধ্যে যখনই তিনি সত্যানুরাগ, ন্যায়-বোধ ও বীর্যবত্তার পরিচয় পাইয়াছেন, তখনই অকুণ্ঠচিত্তে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। যে স্থলে তাঁহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছেন, সেই স্থলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের সতর্ক করিয়া দিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। জাতীয় অগ্রগতির যাত্রীদল তাঁহার কাছ হইতে পাইয়াছেন পথ ও পাথেয় দুইয়েরই সন্ধান। মদমত্ত বিদেশী শাসকগোষ্ঠী যখনই অন্যায় অবিচার করিয়াছেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের নির্ভীক লেখনী তখনই তাঁহাদের সাবধান করিয়া দিয়াছে। সে সতর্কবাণীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা তেজোগর্ভ হইলেও বিদ্বেষ বা বিক্ষোভশূন্য, তাহা যুক্তিপূর্ণ সঙ্গত ও সংযত। বয়কট আন্দোলন যখন প্রবল বেগে চলিতেছিল, তখন আন্দোলনের বিরোধী স্বদেশীয়গণের উপর আন্দোলনের সমর্থক দল কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাচার উপদ্রব করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আন্দোলনের সমর্থক হইয়াও এই অন্যায় পন্থার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমরা অনেকে সম্পূর্ণ জানি না এবং অনেকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে, বয়কট ব্যাপারটা অনেক স্থলে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। আমি যেটাকে ভালো বুঝি দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের দ্বারা অন্য সকলকে তাহা বুঝাইবার বিলম্ব যদি না সহে, পরের ন্যায্য অধিকারে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করাকে অন্যায় মনে করিবার অভ্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া যাইতে থাকে তবে অসংযমকে কোনো সীমার মধ্যে আর ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।...

"...আমি যাহা করিব সকলকেই তাহা করিতেই হইবে, আমি যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতেই হইবে এইরূপ বলপ্রয়োগে সমস্ত মত, ইচ্ছা ও আচরণ বৈচিত্র্যের অপঘাত মৃত্যুর দ্বারা পঞ্চত্ব লাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি।" ("পথ ও পাথেয়")

স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনার মুখে বাঙালী যখন কেবল হৃদয়াবেগ দ্বারা চালিত হইতেছিল এবং সেই হৃদয়াবেগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, তখন দূরদর্শী কবি তাঁহার দেশবাসীকে জাতীয় চরিত্রের সেই ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য আকুল আবেদন জানান। তখন জাতির দৃষ্টি কেবল ভাঙনের দিকেই নিবদ্ধ ছিল বলিয়া তিনি তৎসম্পর্কে জাতিকে সাবধান করিয়া দিয়া গঠনের কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :—

"...হৃদয়াবেগ জিনিষটা উপযুক্ত কাজের দ্বারা বহির্মুখ না হইয়া যখন কেবলি অন্তরে সঞ্চিত ও বর্ধিত হইতে থাকে তখন তাহা বিষের মত কাজ করে—তাহার অপ্রয়োজনীয় উদ্যম আমাদের স্নায়ুমণ্ডলকে বিকৃত করিয়া কর্মসভাকে নৃত্যসভা করিয়া তোলে।

"...পূর্বেই বলিয়াছি যাহার ভিতরে গড়নের শক্তি নাই ভাঙন তাহার পক্ষে মৃত্যু। জিজ্ঞাসা করি আমাদের দেশে সেই গঠনতত্ত্বটি কোথায় প্রকাশ পাইতেছে? কোন্ সৃজনশক্তি আমাদের মধ্যে ভিতর হইতে কাজ করিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া এক করিয়া তুলিতেছে? ভেদের লক্ষণই ত চারিদিকে! নিজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাই যখন প্রবল তখন কোনো মতেই আমরা নিজের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না। তাহা যখন পারি না তখন অন্যে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিবেই—কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না।" ("পথ ও পাথেয়")

দুই

স্বদেশী যুগের মধ্যপর্বে বিদেশী রাজ-শক্তির উদ্দাম দমন-নীতির প্রয়োগে দেশবাসী বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। বিক্ষোভ ও উত্তেজনার মুখে জাতি যেন বিপথগামী না হয় এবং সংযম ও ধৈর্য না হারায়, তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল আবেদন জানাইয়াছেন। দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁহার বাণী :—

"...মানুষ বিস্তৃত মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যা দ্বারা। ক্রোধে বা কামে সেই তপস্যা ভঙ্গ করে, এবং তপস্যার ফলকে এক মুহূর্তে নষ্ট করিয়া দেয়। নিশ্চয়ই আমাদের দেশেও কল্যাণময় চেষ্টা নিভৃতে তপস্যা করিতেছে; দ্রুত ফললাভের লোভ তাহার নাই, সাময়িক আশাভঙ্গের ক্রোধকে সে সংযত করিয়াছে; এমন সময় আজ অকস্মাৎ ধৈর্যহীন উন্মত্ততা যজ্ঞক্ষেত্রে রক্তবৃষ্টি করিয়া তাহার বহুদুঃখসঞ্চিত তপস্যার ফলকে কলুষিত করিবার উপক্রম করিয়াছে।

"ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না; তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহার নিজের আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে; উৎপাতের দ্বারা সেই তপঃসাধনাকে চঞ্চল সুতরাং নিষ্ফল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়।"

উত্তেজনার কুফল সম্পর্কে দেশবাসীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের সাবধান-বাণী :—

"...উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ উত্তেজনাকেই জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় সত্য বলিয়া জানে, যেখানে তাহার অভাব দেখে সেখানে সে কোনও সার্থকতাই দেখিতে পায় না।"

দেশসেবকগণের মধ্যে এক দল যে বিপ্লবের গুপ্ত পথ ধরিয়া চলিতেছিল, তৎকালে লোক-চক্ষুতে ইহা সর্বপ্রথম প্রকাশ পায়। ওই পন্থার অনুসরণে দেশ ও জাতির যে অকল্যাণ হইবে, তাহা ভাবিয়া রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে :—

"...দেশের যে সকল লোক গুপ্ত পন্থাকেই রাষ্ট্রহিতসাধনের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাদিগকে গালি দিয়াও কোন ফল হইবে না এবং তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিতে গেলেও তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমরা যে যুগে বর্তমান, এ যুগে ধর্ম যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিকট প্রকাশ্য ভাবে কুণ্ঠিত, তখন এরূপ ধর্মভ্রংশতার যে দুঃখ তাহা সমস্ত মানুষকেই নানা আকারে বহন করিতেই হইবে ; রাজা ও প্রজা, প্রবল ও দুর্বল, ধনী ও শ্রমী কেহ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। রাজাও প্রয়োজনের জন্য প্রজাকে দুর্নীতির দ্বারা আঘাত করিবে এবং প্রজাও প্রয়োজনের জন্য রাজাকেও দুর্নীতির দ্বারাই আঘাত করিবে এবং যে সকল তৃতীয় পক্ষের লোক এই সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত নহে তাহাদিগকেও এই অধর্ম সংঘর্ষের অগ্নিদাহ সহ্য করিতে হইবে।"

এই দুর্গম গুপ্ত পথের দুঃসাহসী যাত্রীদলকে প্রবল রাজপক্ষ ক্ষিপ্ত হইয়া চণ্ড নীতির প্রয়োগে উৎপাটিত করার চেষ্টা করিলে তাহার ফল যে বিপরীত হইবে তৎসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ খোলাখুলি তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিতে দ্বিধা করেন নাই। তিনি রাজপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এই বলিয়া :—

"…লোকের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া আছে। উত্তেজনা এতই তীব্র যে, যে সকল সাংঘাতিক ব্যাপার আমাদের দেশে অসম্ভব বলিয়া মনে করা যাইত তাহাও সম্ভবপর হইয়াছে। বিরোধবুদ্ধি এতই গভীর এবং সুদূরবিস্তৃতভাবে ব্যাপ্ত যে কর্তৃপক্ষ ইহাকে বলপূর্বক কেবল স্থানে স্থানে উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিয়া কখনই নিঃশেষ করিতে পারিবেন না, বরঞ্চ ইহাকে আরও প্রবল ও প্রকাণ্ড করিয়া তুলিবেন।" ("পথ ও পাথেয়")

বিদেশী শাসকগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কীকরণে যে কিছুমাত্র কর্ণপাত করেন নাই, তাঁহাদের অনুসৃত নিগ্রহ-নীতির কঠোরতা বৃদ্ধি হইতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু কবি-বাণী তো মিথ্যা হয় নাই। স্বদেশী-যুগের মধ্যপর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া গান্ধী-যুগের দ্বিতীয় আইন অমান্য (সিভিল্ ডিস্ওবিডিয়েন্স্) আন্দোলন পর্যন্ত পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের ভারতবর্ষের রাজনীতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দমন-নীতির কঠোরতায় গুপ্ত বিপ্লব-পন্থী মুক্তি-সাধকেরা ভীত ও দুর্বল হওয়া তো দূরের কথা বরং দুঃসাহসী ও প্রবল হইয়াই উঠিয়াছিল। আইনের অস্ত্রাগার হইতে পুরাতন মরিচা-ধরা অস্ত্র বাহির করিয়া শানাইয়া লইয়া তাহা প্রয়োগ করা হইল, নূতন নূতন আইন রচিত ও প্রযুক্ত হইল,—কিন্তু কিছুই তো ফলপ্রদ হইল না। বৈদেশিক রাজশক্তির প্রতিকূলে সৃষ্ট 'বিরোধবুদ্ধি' যে 'গভীর এবং সুদূরবিস্তৃতভাবে ব্যাপ্ত', তাহা রবীন্দ্রনাথ নিজে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই স্বৈরাচারী শাসকগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্ষমতার মাদকতায় মত্ত বলিয়া তাঁহারা ইহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে যখন 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের বিদেশী রাজশক্তিকে বলপূর্বক উচ্ছেদের ব্যাপক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া আলিপুর বোমার মামলার

উদ্ভব হয়, তখন শাসকগোষ্ঠীর টনক নড়িল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহারা দূরদর্শী ভারতীয় মনীষীর সদুপদেশ অনুসরণ করিয়া চলিলেন না এবং রুদ্র নীতির ভ্রান্ত পথ পরিহার করিলেন না। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে গুপ্ত বিপ্লবের পথ বর্জিত হইয়াছিল, মহামানব গান্ধীজীর প্রদর্শিত ও অনুসৃত পন্থার সাফল্যে এবং তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের বিস্ময়কর প্রভাবে।

ওই 'বিরোধবুদ্ধি' বলপ্রয়োগে উৎপাটিত করিয়া নিঃশেষ করার চেষ্টা যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া যাইবে এবং উহার ফল যে বিপরীত হইবে, সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট সাবধান-বাণী রবীন্দ্রনাথ আর একটি প্রবন্ধের মাধ্যমেও রাজপক্ষকে শুনাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

"...বলিষ্ঠ যখন মনে করে যে, নিজের অন্যায় করিবার অবাধ অধিকারকে সে সংযত করিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে অনিবার্য প্রতিকারচেষ্টা মানব-হৃদয়ে ক্রমশই ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে তাহাকেই একমাত্র অপরাধী করিয়া দলিত করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিবে তখনই বলের দ্বারাই প্রবল আপনার বলের মূলে আঘাত করে;—কারণ তখন সে অশক্তকে আঘাত করে না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে শক্তি আছে সেই বজ্রশক্তির বিরুদ্ধে নিজের বদ্ধমুষ্টি চালনা করে।"

এই উদ্ধৃতি দিলাম রবীন্দ্রনাথের "সমস্যা" নামক প্রবন্ধ হইতে। প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধের অনুবৃত্তিস্বরূপ। "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে তিনি যে "দুইটি কথার আলোচনা" করিয়াছেন, তাহা হইল এই :—প্রথমতঃ দেশহিত ব্যাপারটা কী অর্থাৎ তাহা দেশী কাপড় পরা বা ইংরেজ তাড়ানো বা আর কিছু? দ্বিতীয়তঃ সেই হিতসাধন করিতে হইবে কেমন করিয়া?" "সমস্যা" প্রবন্ধে তিনি আমাদের সম্মুখে সমস্যা উত্থাপিত করিয়াই নিজ কর্তব্য সমাপ্ত

করেন নাই। সমস্যা কঠিন এবং জটিল হইলেও তাহার সমাধানের পথের সন্ধানও তিনি আমাদের দিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে শুনাইয়াছেন আশার বাণী :—

"ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছে। সেই আহ্বান যে সংবাদপত্রের ক্রুদ্ধ গর্জনের মধ্যেই ধ্বনিত হইয়াছে বা হিংস্র উত্তেজনার মধ্যেই তাহার যথার্থ প্রকাশ এ কথা আমরা স্বীকার করিব না। কিন্তু সেই আহ্বান যে আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্বোধিত করিতেছে তাহা তখনই বুঝিতে পারি যখন দেখি আমরা জাতিবর্ণনির্বিচারে—দুর্ভিক্ষ-কাতরের দ্বারে অন্নপাত্র বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছি, যখন দেখি ভদ্রাভদ্র বিচার না করিয়া প্রবাসে সমাগত যাত্রীদের সহায়তার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি, যখন দেখি রাজপুরুষদের নির্মম সন্দেহ ও প্রতিকূলতার মুখেও অত্যাচার প্রতিরোধের প্রয়োজন-কালে আমাদের যুবকদিগকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা বাধা দিতেছে না। সেবায় আমাদের সঙ্কোচ নাই, কর্তব্যে আমাদের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে, পরের সহায়তায় আমরা উচ্চনীচের বিচার বিস্মৃত হইয়াছি, এই যে সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহা হইতে বুঝিয়াছি, এবার আমাদের উপর যে আহ্বান আসিয়াছে তাহা সমস্ত সঙ্কীর্ণতার অন্তরাল হইতে আমাদিগকে বাহিরে আনিবে—ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পড়িয়াছে। এবারে, সেখানে যাহার কোনো অভাব তাহা পূরণ করিবার জন্য আমাদিগকে যাইতে হইবে;—অন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিতরণের জন্য আমাদিগকে নিভৃত পল্লীর প্রান্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে; আমাদিগকে আর কেহই নিজের স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। বহুদিনের শুষ্কতা ও অনাবৃষ্টির পর বর্ষা যখন আসে তখন সে ঝড় লইয়াই আসে—কিন্তু নববর্ষার সেই আরম্ভকালীন ঝড়টাই এই

নূতন আবির্ভাবের বড় অঙ্গ নহে, তাহা স্থায়ীও হয় না। বিদ্যুতের চাঞ্চল্য বজ্রের গর্জন এবং বায়ুর উন্মত্ততা আপনি শান্ত হইয়া আসিবে,— তখন মেঘে মেঘে জোড়া লাগিয়া আকাশের পূর্ব-পশ্চিম স্নিগ্ধতায় আবৃত হইয়া যাইবে—চারিদিকে ধারা বর্ষণ হইয়া তৃষিতের পাত্রে জল ভরিয়া উঠিবে এবং ক্ষুধিতের ক্ষেত্রে অন্নের আশা অঙ্কুরিত হইয়া দুই চক্ষু জুড়াইয়া দিবে। মঙ্গলে পরিপূর্ণ সেই বিচিত্র সফলতার দিন বহুকাল প্রতীক্ষার পর আজ ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে এই কথা নিশ্চিত জানিয়া আমরা যেন আনন্দে প্রস্তুত হই। কিসের জন্য? ঘর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে নামিবার জন্য, মাটি চষিবার জন্য, বীজ বুনিবার জন্য—তাহার পরে সোনার ফসলে যখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে তখন সেই লক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়া নিত্যোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিব।" ("সমস্যা")

নিজের মতে অনিবার জন্য অপরের উপর বলপ্রয়োগ এবং অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের নিন্দা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বদেশী-যুগে লিখিত আর একটি প্রবন্ধে। "পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোবা নাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নি প্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা"—এই সমুদয়ের বিরুদ্ধে স্পষ্ট কঠোর মন্তব্য করা হইয়াছে "সদুপায়" প্রবন্ধটির মধ্য দিয়া। ওই প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল ১৩১৫ সালে (১৯০৮ খ্রীঃ) "চন্দননগরের মেয়রকে হত্যার আয়োজন" এবং "কুষ্টিয়ার নিতান্ত নিরপরাধ পাদ্রির পৃষ্ঠে গুলি বর্ষিত" হওয়ার ঘটনার পরে। দূরদর্শী দেশহিতৈষী চিন্তানায়কের ব্যথিত চিত্তের খেদোক্তি :—

"...কাজ ফাঁকি দিবার জন্য পথ বাঁচাইবার জন্য আমরা যখনই এই সকল উপায় অবলম্বন করি তখনি প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের কী অমূল্য ধন তাহা আমরা জানি না। আমরা

মনে করি আমার মতে সকলকে চালানই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয়; অতএব সকলে যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে জবরদস্তি।"

দেশের হিত-সাধনপ্রচেষ্টায় দেশবাসীর ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা রবীন্দ্রনাথ শুধু যে অন্যায় মনে করিতেন তাহা নহে, ইহাতে দেশের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইবে বলিয়াই তাঁহার ধারণা। উত্তরকালে সেই ধারণা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। নিজের মতে আনিবার জন্ম প্রবল পক্ষ দুর্বল পক্ষের উপর বলপ্রয়োগ করিবে, ইহা তিনি কোন অবস্থায়ই সমর্থন করেন নাই। তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন :—

"...দেশের একপক্ষ প্রবল হইয়া কেবল মাত্র জোরের দ্বারা অপর ক্ষীণ পক্ষকে নিজের মত-শৃঙ্খলে দাসের মতো আবদ্ধ করিবে ইহার মতো ইষ্টহানিও আর কিছু হইতে পারে না। এমন করিয়া বন্দে মাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবে না—এবং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে ভ্রাতৃদ্রোহিতা করা হইবে। সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না,—ভয় দেখাইয়া, এমন কি কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্যসাধন বলে না। এ সকল প্রণালী দাসত্বেরই প্রণালী।"

বলপ্রয়োগের পন্থা অনুসরণ দ্বারা জাতীয় প্রগতি ব্যাহত হইবে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের সুবিবেচিত অভিমত। তাঁহার মতে—"অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তখন কে কাহাকে কিসের দোহাই দিয়া কোন্ সীমার মধ্যে সংযত করিবে? দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্‌খানে ঠেকাইব?"

বলপ্রয়োগের পন্থা, অবৈধ উপায়, অন্যায়ের পথ পরিহার করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ দেশ ও জাতিকে জানাইয়াছেন আকুল আবেদন। কেন না তিনি জানিতেন যে, ওই সমুদয় পথে চলিয়া আমাদের কল্যাণ সাধিত হওয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ অমঙ্গলই হইবে বেশি। এই সম্পর্কে তাঁহার মতামতে যে ভাবাবেগের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই তাহা হইতে বুঝা যায় যে, দেশের ভাবী অমঙ্গল চিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তবে তাঁহার মতামতে ভাবাবেগ যেমন রহিয়াছে, সুযুক্তিও আছে যথেষ্ট। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন শক্তির উৎস এবং দুর্বলতার উৎপত্তিস্থানের প্রতি, দেশকে আহ্বান করিয়াছেন প্রশস্ত ধর্মের পথ ধরিয়া চলিবার জন্য। তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠের বাণী :—

"অদ্য বারবার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্যই দুর্বলতা; প্রশস্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির সম্মান এবং উৎপাতের সঙ্কীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা, তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবের মনুষ্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাস। অসংযম নিজকে প্রবল বলিয়া অহঙ্কার করে; কিন্তু তাহার প্রবলতা কিসে? সে কেবল আমাদের যথার্থ অন্তরতর বলের সম্বলকে অপহরণ করিবার বেলায়। এই বিকৃতিকে যে-কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একবার প্রশ্রয় দিলে শয়তানের কাছে মাথা বিকাইয়া রাখা হয়।" ("সদুপায়")

তিন

"ইম্পিরিয়ালিজম্," "রাজভক্তি" এবং "বহুরাজকতা"—এই সুচিন্তিত প্রবন্ধ তিনটি লিখিত হইয়াছে ১৩১২ সালে অর্থাৎ স্বদেশী-আন্দোলনের প্রথম বৎসরে। ওই তিনটি প্রবন্ধ এবং পূর্বালোচিত "পথ ও পাথেয়"

এবং "সমস্যা" প্রবন্ধ দুইটি গ্রথিত হইয়াছে "রাজা প্রজা" গ্রন্থে। "ইম্পিরিয়ালিজম্" প্রবন্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দুর্বল জাতির স্বাধীনতা হরণপূর্বক অন্যায়ভাবে সাম্রাজ্যবিস্তারের দুর্লালসা ও দুর্নীতিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হইয়াছে। বিংশ শতকের প্রথম দশকে ইংলণ্ডের অধিকাংশ প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী রাজনীতিবিদ্ ইম্পিরিয়ালিজমের মাদকতায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—

"বিলাতে ইম্পিরিয়ালিজমের একটা নেশা ধরিয়াছে। অধীন দেশ ও উপনিবেশ প্রভৃতি জড়াইয়া ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে একটা বৃহৎ উপসর্গ করিয়া তুলিবার ধ্যানে সে দেশে অনেকে নিযুক্ত আছেন। বিশ্বামিত্র একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, বাইবেল-কথিত কোন রাজা স্বর্গের রাজার প্রতি স্পর্ধা করিয়া এক স্তম্ভ তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বয়ং দশাননের সম্বন্ধেও এরূপ একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

"দেখা যাইতেছে এইরূপ বড় বড় মতলব পৃথিবীতে অনেক সময় অনেক লোকে মনে মনে আঁটিয়াছে। এ সকল মতলব টেকে না— কিন্তু নষ্ট হইবার পূর্বে পৃথিবীতে কিছু অমঙ্গল না সাধিয়া যায় না।

"তাহাদের দেশের এই খেয়ালের ঢেউ লর্ড কার্জনের মনের মধ্যেও যে তোলপাড় করিতেছে সেদিনকার এক অলক্ষণে বক্তৃতায় তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন।"

ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাধিপাল (Chancellor)-স্বরূপ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি সমাবর্তন-উৎসব উপলক্ষে যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রসঙ্গক্রমে পাশ্চাত্ত্য দেশ ও প্রাচ্য দেশের অধিবাসীগণের চরিত্রের সমালোচনা করিয়া পাশ্চাত্ত্য দেশের সত্যবাদিতার প্রশংসা

করিয়াছিলেন এবং প্রাচ্য দেশের ধূর্ততার নিন্দা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অন্যায় মন্তব্যের মধ্য দিয়া যে উগ্র সাম্রাজ্যবাদের দাম্ভিকতা প্রকট হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে সেই মন্তব্যের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইম্পিরিয়ালিজমের নেশায় মত্ত হইয়া প্রবল জাতি যে দুর্বল জাতির ন্যায্য অধিকারে অন্যায়রূপে হস্তক্ষেপ করে এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ করিতে চেষ্টিত হয়, তাহা তিনি নির্মমতা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী স্বজাতির একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভারতবর্ষের মত একটা বৃহৎ দেশের অসংখ্য অধিবাসীকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল! রবীন্দ্রনাথের বিচারে ইহা অধর্ম বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। ইম্পিরিয়ালিজমকে তিনি কশাঘাত করিয়াছেন এই বলিয়া :—

"অনেক লোকে জন্তুকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে পীড়া বোধ করে। কিন্তু কষ্ট দেওয়ার একটা নাম যদি দেওয়া যায় 'শিকার' তবে সে ব্যক্তি আনন্দের সহিত হত আহত নিরীহ পাখীর তালিকা বৃদ্ধি করিয়া গৌরব বোধ করে। নিশ্চয়ই, বিনা উপলক্ষ্যে যে ব্যক্তি পাখীর ডানা ভাঙিয়া দেয়, সে ব্যক্তি শিকারীর চেয়ে নিষ্ঠুর, কিন্তু পাখীর তাহাতে বিশেষ সান্ত্বনা নাই। বরঞ্চ অসহায় পক্ষিকুলের পক্ষে স্বভাব-নিষ্ঠুরের চেয়ে শিকারীর দল অনেক বেশি নিদারুণ।

"ভারতবর্ষের কোন স্থানে তাহার স্বাধীন শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া ইংরেজ সভ্যনীতি অনুসারে নিশ্চয়ই লজ্জাকর; কিন্তু যদি মন্ত্র বলা যায় 'ইম্পিরিয়ালিজম্'—তবে যাহা মনুষ্যত্বের পক্ষে একান্ত লজ্জা তাহা রাষ্ট্রনীতিকতার পক্ষে চূড়ান্ত গৌরব হইয়া উঠিতে পারে।

"নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য একটা বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য পৃথিবীর জনসমাজে

সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব নিরুপায় করিয়া তোলা যে কত অধর্ম, কী প্রকাণ্ড নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই অধর্মের গ্লানি হইতে আপনার মনকে বাঁচাইতে হইলে একটা বড় বুলির ছায়া লইতে হয়।" ("ইম্পিরিয়ালিজম")

প্রায় অর্ধশতক পূর্বে রচিত ওই "ইম্পিরিয়ালিজম" প্রবন্ধটি পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, যেন আধুনিক কালের কোন সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত রাজনীতিবিদের রচনা পড়িতেছি কিংবা ভাষণ শুনিতেছি। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা যে কত অগ্রগামী, তাহার প্রমাণ আলোচ্য প্রবন্ধ হইতেও মিলিবে। তিনি যে ইম্পিরিয়ালিজমের কিরূপ বিরোধী ছিলেন এবং ইম্পিরিয়ালিস্টের অনুসৃত নীতি ও পন্থাকে কতটা গর্হিত মনে করিতেন, নিম্নোদ্ধৃত উক্তির মধ্য দিয়া তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে:—

"ব্যক্তিগত ব্যবহারে যে সকল কার্যকে চৌর্য, মিথ্যাচার বলে, যাহাকে জাল, খুন, ডাকাতি নাম দেয়, একটা ইজম্‌-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে তাহাকে শোধন করিয়া কতদূর গৌরবের বিষয় করিয়া তোলে, বিলাতি ইতিহাসের মান্য ব্যক্তিদিগের চরিত্র হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।"

"বহুরাজকতা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের ভারত-শাসন-নীতির নিন্দা করিয়াছেন, কেননা সেই নীতির লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষকে শোষণ করিয়া ব্রিটেনকে সমৃদ্ধ করা। তাঁহার মতে ব্রিটিশ জাতির ভরণ-পোষণ ও সুখ-স্বচ্ছন্দতা নির্ভর করিতেছে ভারতবাসীকে শোষণ করার উপর; ভারতীয়গণ যদি শোষিত ও নিঃস্ব হয়, তবেই ইংরেজেরা পুষ্ট ও বিত্তশালী হইবে। তিনি বলিয়াছেন:—

"...দেশ একজন রাজাকে বহন করিতে পারে, কিন্তু একটা গোটা জাতকে রাজা বলিয়া বহন করা দুঃসাধ্য।..."

"...একটা আস্ত জাত নিজের দেশে বাস করিয়া অন্য দেশকে শাসন করিতেছে ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ইতিহাসে ঘটে নাই। অত্যন্ত ভাল রাজা হইলেও এ রকম অবস্থায় রাজার বোঝা বহন করা দেশের পক্ষে বড় কঠিন।..."

"...একটা জাতির অন্নের ভার অনেকটা পরিমাণে আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে ; সেই অন্ন নানা রকম আকারে নানা রকম পাত্রে যোগাইতে হইতেছে।..."

লর্ড কার্জনের শাসনকালে মুসলমান বাদশাহগণের অনুকরণে দিল্লীতে যে দরবারের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে "রাজভক্তি" প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"...প্রাচ্য রাজমাত্রেই বুঝিতেন দরবার স্পর্ধা প্রকাশের জন্য নহে ; দরবার রাজার সহিত প্রজাদের আনন্দ-সম্মিলনের উৎসব। সেদিন কেবল রাজোচিত ঐশ্বর্যের দ্বারা প্রজাদিগকে স্তম্ভিত করা নয়, সেদিন রাজোচিত ঔদার্যের দ্বারা তাহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিবার দিন। সেদিন ক্ষমা করিবার, দান করিবার, রাজ-শাসনকে সুন্দর করিয়া সাজাইবার শুভ অবসর।"

কিন্তু লর্ড কার্জনের দিল্লীর দরবারে এই সমুদয়ের কিছুই ছিল না, ছিল শুধু স্পর্ধার প্রকাশ, আর ঐশ্বর্যের বহ্বাড়ম্বর। রবীন্দ্রনাথ খোলাখুলি বলিয়াছেন যে, রাজপুরুষদের প্রতাপের আড়ম্বরে "আমাদের চোখ ধাঁধিয়া যায়, হৃৎকম্পও হইতে পারে, কিন্তু রাজাপ্রজার মধ্যে অন্তরের বন্ধন দৃঢ় হয় না—পার্থক্য আরও বাড়িয়া যায়।" তাঁহার মতে প্রজাকুলের ভক্তিভাজন হইতে হইলে রাজাকে দিল্লী-দরবার-জাতীয় স্পর্ধা ও দম্ভের পথ পরিহার করিয়া অনুসরণ করিতে হইবে নম্রতার পথ, যেহেতু "প্রেমের পথ নম্রতার পথ"। রাজভক্তি যে কখনও বলপ্রয়োগে আদায় করা যাইতে পারে না

সেই কথাটা রবীন্দ্রনাথ রাজপক্ষকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এই ভাবে :—

"...ভারতবর্ষের ইংরেজ-রাজা যে আমাদের কাছ হইতে রাজভক্তির দাবীটুকুও ছাড়িতে পারে না। কিন্তু ভক্তির সম্বন্ধ হৃদয়ের সম্বন্ধ—সে সম্বন্ধে দান-প্রতিদান আছে—তাহা কলের সম্বন্ধ নহে। সে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলেই কাছে আসিতে হয়, তাহা শুদ্ধমাত্র জবরদস্তির কর্ম নহে। কিন্তু কাছেও ঘেঁষিব না, হৃদয়ও দিব না—অথচ রাজভক্তিও চাই। শেষকালে সেই ভক্তি সম্বন্ধে যখন সন্দেহ জন্মে, তখন গুর্খা লাগাইয়া, বেত চালাইয়া, জেলে দিয়া ভক্তি আদায় করিতে ইচ্ছা হয়।"

চার

চণ্ডনীতির বিভীষিকায় দেশ যেন ভীত না হয়, নিস্তেজ ও নির্বীর্য হইয়া না পড়ে, আদর্শভ্রষ্ট হইয়া না যায়,—তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ আন্তরিক আবেদন জানাইয়াছেন স্বদেশবাসীর নিকট। পৌরুষ-দীপ্ত কণ্ঠে তিনি জাতিকে শুনাইয়াছেন অভয়-বাণী :—

"দেবই হউন, আর দানবই হউন, লাটই হউন, আর জ্যাকই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা আর নাই। হে ভারতবর্ষ, সেখানে তুমি তোমার চিরদিনের উদার অভয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত লাঞ্ছনার ঊর্ধ্বে তোমার মস্তককে অবিচলিত রাখো—এই সমস্ত বড় বড় নামধারী মিথ্যাকে সর্বান্তঃকরণের দ্বারা অস্বীকার করো, ইহারা যেন বিভীষিকার মুখোস পরিয়া তোমার অন্তরাত্মাকে লেশমাত্র সঙ্কুচিত করিতে না পারে। তোমার আত্মার দিব্যতা উজ্জ্বলতা, পরমশক্তিমত্তার কাছে এই সমস্ত তর্জন গর্জন, এই সমস্ত উচ্চ পদের অভিমান, এই সমস্ত শাসনশোষণের আয়োজন আড়ম্বর

তুচ্ছ ছেলেখেলা মাত্র—ইহারা যদিবা তোমাকে পীড়া দেয় তোমাকে যেন ক্ষুদ্র করিতে না পারে। যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেইখানেই নত হওয়ার গৌরব—যেখানে সে সম্বন্ধ নাই সেখানে যাহাই ঘটুক, অন্তঃকরণকে মুক্ত রাখিও, ঋজু রাখিও, দীনতা স্বীকার করিও না, ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিও, নিজের প্রতি অক্ষুন্ন আস্থা রাখিও। কারণ নিশ্চয়ই জগতে তোমার একান্ত প্রয়োজন আছে—সেজন্য বহু দুঃখেও তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হও নাই। অন্যের বাহ্য অনুকরণের চেষ্টা করিয়া তুমি যে এতকাল পরে একটা ঐতিহাসিক প্রহসন রচনা করিবার জন্য এতদিন বাঁচিয়া আছ, তাহা কখনই নহে। তুমি যাহা হইবে যাহা করিবে অন্য দেশের ইতিহাসে তাহার নমুনা নাই—তোমার যথাস্থানে তুমি বিশ্বভূবনের সকলের চেয়ে মহৎ। হে আমার স্বদেশ, মহাপর্বতমালার পাদমূলে মহাসমুদ্র-পরিবেষ্টিত তোমার আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে—এই আসনের সম্মুখে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ বিধাতার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে, তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্বার একদিন গ্রহণ করিবে, তখন আমি নিশ্চয়ই জানি—তোমায় মন্ত্রে কি জ্ঞানের, কি কর্মের, কি ধর্মের অনেক মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং তোমার চরণপ্রান্তে আধুনিক নিষ্ঠুর পোলিটিক্যাল কালভুজঙ্গের বিশ্বদ্বেষী বিষাক্ত দর্প পরিশ্রান্ত হইবে। তুমি চঞ্চল হইও না, লুব্ধ হইও না, ভীত হইও না, তুমি 'আত্মানং বিদ্ধি' আপনাকে জানো এবং 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত,' 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি' উঠ, জাগো যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই পাইয়া প্রবুদ্ধ হও, যাহা যথার্থ পথ তাহা ক্ষুরধার-শাণিত দুর্গম দুরত্যয়, কবিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।"

যখন লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য সরকার পক্ষের তোড়জোড় চলিতেছিল, তখন সেই আসন্ন জাতীয়

বিপর্যয়কে রোধ করিবার জন্যও বাঙালীরা প্রস্তুত হইতেছিল। ১৩১২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের মধ্যভাগে বঙ্গব্যবচ্ছেদের সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হয়। শ্রাবণের শেষ ভাগে (১৯০৫ খ্রীঃ ৭ই আগস্ট) বিলাতী দ্রব্য বর্জন বা বয়কট আন্দোলন আরম্ভ হইল। 'ভাণ্ডার' পত্রের প্রথম বৎসরের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের "উদ্বোধন" শীর্ষক একটি চমৎকার প্রবন্ধ বাহির হয়। প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল বঙ্গ-মহিলাদের জন্য এবং একটি মহিলা-সভায় উহা জনৈক মহিলা কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাংলার নবজাগরণে বঙ্গনারীকে কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রবন্ধের এক স্থলে আছে :—

"প্রতিদিন সংসারে কর্মশালার দ্বার প্রথম কে উদ্ঘাটন করে? গৃহলক্ষ্মী নারী। যখন সকলে নিদ্রিত, তখন জীব-ধাত্রী ধরণীর এই কন্যাগণই জাগরণকালের প্রথম ব্যবস্থা করিবার জন্য শয়নগৃহ হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসেন। জাগ্রত জগতের স্নান-পান, পোষণ-তোষণের জন্য দিবসের সর্বপ্রথমেই রমণীগণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দেন। এই যে প্রতিদিনের প্রয়োজন সমাধার জন্য—এই যে প্রতিদিনের মঙ্গল সাধনের জন্য সংসারে রমণীর প্রথম জাগরণ, প্রথম উদ্যোগ,—ইহার দ্বারাই জগতের প্রত্যেক দিবস পবিত্র হইয়াছে, সুন্দর হইয়াছে।

"আজ প্রত্যূষে কেবল আমাদের প্রাত্যহিক—আমাদের সাংসারিক ক্ষুদ্র দিনের নহে—আমাদের দেশের, আমাদের জাতির একটি মহৎ দিনের অভ্যুদয়কাল আমাদের অন্তঃকরণের সম্মুখে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই জ্যোতি সমুজ্জ্বল দিব্য দিবারম্ভের প্রথম বিহঙ্গগান আজ শুনা যাইতেছে—সেই দিব্য প্রথম বায়ু-হিল্লোলে অরণ্যের প্রত্যেক পল্লবের মধ্যে আজ একটি মর্মরিত আন্দোলন দেখা যাইতেছে— কিন্তু আজ নারী কোথায়? এই সুপ্রভাতের শুকতারা আজ

কোন্‌খানে? দেশের সুদিনকে বরণ করিয়া লইবার জন্য আজ দেশের কন্যাগণ কি এখনো প্রস্তুত হন নাই?

"আমাদের মাতৃগণ, আমাদের ভগিনীগণ, আমাদের কল্যাণীয় কন্যাগণ, দেশ তোমাদের প্রসন্নতার জন্য চাহিয়া আছে। তোমরা প্রস্তুত হও। তোমরা প্রীত হও! তবেই দেশের নবজাগরণ সুন্দর হইবে, সম্পূর্ণ হইবে। তোমরা যদি উদাসীন থাক, যদি বিমুখ হও, তবে বাহিরের ব্যাঘাতের অপেক্ষা ঘরের কণ্টকের দ্বারা দেশের যাত্রাপথ দ্বিগুণতর দুর্গম হইয়া উঠিবে। পরম দুঃখের দিনে ঈশ্বর যে কল্যাণকে আমাদের দেশে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাকে তোমরা মাতৃরূপে, পত্নীরূপে, ভগিনীরূপে গ্রহণ কর, বরণ করিয়া লও। তাহাকে জয়মাল্যে ভূষিত কর, তাহাকে তোমাদের বিগলিত হৃদয়ধারায় অভিষিক্ত করিয়া দাও।"

এই উপাদেয় প্রবন্ধটির উপসংহার আরও প্রাণস্পর্শী! উপসংহার এইরূপ :—

"আর তোমরা—যাহারা আজ বিশ্ব-বঙ্গের বেদনায় ব্যথা পাইয়াছ, বিশ্ব-বঙ্গের মিলনাবেগে গৌরব অনুভব করিতেছ, তোমরা আজ সকলে প্রস্তুত হইয়া এস, তোমাদের দুটি চক্ষু হইতে বিদেশী হাটের মোহাঞ্জন আজ চোখের জলে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া এস—যে বিদেশের অলঙ্কার তোমাদের অঙ্গকে সোনার শৃঙ্খলে আপাদ-মস্তক বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, আজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া এস, আজ তোমাদের যে লজ্জা, তাহা প্রীতির সজ্জা হউক, মঙ্গলের সজ্জা হউক, তাহাতে বিদেশের রেশম-পশম-লেস্‌-ফিতার জাল-জালিয়াতি অপেক্ষা তোমাদিগকে অনেক বেশী মানাইবে। আমরা আজ সমস্ত দেশের চেয়ে নিজেকে বেশী বুদ্ধিমতী বলিয়া প্রমাণ করিতে নাই বলিলাম। দেশকে আমাদের তর্ক, আমাদের বুদ্ধি উৎসর্গ করিলাম! এই

বুঝিলাম যে, সমস্ত দেশকে অভূতপূর্বরূপে আজ এই যে এক আবেগ বিচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের কর্ম—দেশের এই উদ্বোধনে নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি—দেশের এই উদ্যোগে যোগ দিয়া তাঁহারই পূজা সমাধা করি।

"তবে আজ বঙ্গের মাতা, বঙ্গের বধূ, বঙ্গের কুমারীগণ, তোমরা দেশের নবপ্রভাতের আরম্ভে শঙ্খধ্বনি করিয়া দেশের পুরুষযাত্রীগণকে বল, তোমাদের যাত্রা সার্থক হউক, তোমাদের কল্যাণ হউক, তোমাদের জয় হউক, তোমাদের যাত্রাপথে আমরা পুষ্পবর্ষণ করি!—বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেশের পুরুষকণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বল—বন্দে মাতরম্।"

———

॥ রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার আদর্শ ॥

স্বদেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ—স্বজাতির প্রতি তাঁহার মমত্ববোধ ছিল গভীর ও খাঁটি। স্বদেশ ও স্বজাতি সম্পর্কে তাঁহার রচনা, উক্তি এবং অনুষ্ঠিত কার্যাবলী হইতে ইহার পরিচয় মিলে। তাঁহার স্বাদেশিকতা বা স্বাজাতিকতার মধ্যে পরদেশ কিংবা পরজাতির প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষের কোন স্থান ছিল না। তাহা ছিল সর্বদেশের কল্যাণ-কামনায় সমুজ্জল, সর্বজাতির প্রতি প্রীতিতে স্নিগ্ধ। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ শুধু সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; তাঁহার স্বাদেশিক ভাবধারায় নিম্ন স্তরের মানব-সন্তানেরা—সর্বহারা, দুর্গত, দুর্ভাগা জনেরা স্থান পাইয়াছে আর সকলের আগে। ইহাদেরই দুঃখ-দুর্দশা কবি-চিত্তে জাগাইয়াছে বেদনা-বোধ, আর বেদনার সেই অনুভূতিই কবিকে দিয়াছে ভাব-ব্যঞ্জনার লোকাতীত প্রেরণা। কবির লেখনী-মুখে নির্গত হইয়াছে করুণা ও সমবেদনার বিগলিত ধারা, কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে আশা ও বিশ্বাসের অমোঘ বাণী।

মানব-সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ অপর শ্রেণীর মানুষের উপর যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে অত্যাচার-অবিচার চালাইয়া আসিয়াছে, উহার ফলে শেষোক্ত শ্রেণীকে নামিয়া আসিতে হইয়াছে দুর্গতির শেষ স্তরে। দরদী কবির দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইয়াছে সেই শোচনীয় চিত্র—মানবতার চরম লাঞ্ছনার মর্মান্তিক আলেখ্য! কবি দেখিতে পাইয়াছেন—ইহাদের বাকৃশক্তি থাকিলেও বেদনা প্রকাশের মনোবল নাই, সুতরাং বাকৃশক্তিহীন হইয়াও ইহারা 'নতশির মূক সবে'। কবি ব্যথিত-চিত্তে পাঠ করিয়াছেন ইহাদের—'ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী।' ইহারা এমনই অসহায় যে,—

ইহাদের স্কন্ধে দুঃখ-কষ্টের ভার যতই চাপাইয়া দেওয়া হউক না কেন, ইহারা ভারবাহী নিরীহ জন্তুর মতো তাহা মন্থরগতিতে বহিয়াই চলিয়াছে। তবু এই শ্রেণীর রিক্ত-বঞ্চিত জনেরা—দুর্গত-লাঞ্ছিত মানব-সন্তানেরা নিজের অদৃষ্টকে পর্যন্ত ভর্ৎসনা করে না, মানুষকে দোষারোপ করে না। এই দুঃসহ দুরবস্থার মধ্য দিয়াই তাহারা—'শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনো মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া।' আর—

"………সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে" … … … …

রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রতি মানুষের ওই অমানুষিক আচরণে ব্যথিত হইয়াছেন সত্য, মানব-সন্তানকে দুঃখ-দুর্গতির চরম অবস্থায় পতিত দেখিয়া বেদনা পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু নৈরাশ্যে ভাঙিয়া পড়েন নাই। তাই কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে আশার বাণী, নিনাদিত হইয়াছে বোধনের বিষাণ। এই সকল দুর্গত নির্যাতিত মানবের মুক্তির জন্য মরমী কবির দৃঢ়সংকল্প। সেই সংকল্পের অভিব্যক্তি হইয়াছে এই ভাবে—

"………এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে,
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মতো সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে।"

রবীন্দ্রনাথের যে প্রাণস্পর্শী অনবদ্য কবিতা ('এবার ফিরাও মোরে') হইতে উদ্ধৃতি দিলাম, তাহা রচিত হইয়াছিল প্রায় ৫৯ বৎসর পূর্বে—বাঙলার নবজাগৃতির যুগের প্রবর্তক স্বদেশী আন্দোলনের প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে।

আমাদের সমাজে যাহারা আভিজাত্যের গর্বে অন্ধ হইয়া 'মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে' ঘৃণা করিয়াছে 'মানুষের প্রাণের ঠাকুরে'—তাহারা যে একদা 'বিধাতার রুদ্র রোষে' পড়িয়া ইহাদেরই মতো অপমানিত হইবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিতে পাই 'অপমানিত' কবিতায়। পরদুঃখ-কাতর কবি-চিত্তের বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে এই ভাবে—

> "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
> অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।
> মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
> সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
> অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান॥"

বৃটিশ রাজের শাসন-কালে আমাদের দেশে যখন রাজনীতিক অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং সেই আন্দোলনের ধারা ক্রমশঃ বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন দেশের সাধারণ-জনের তাহাতে কোন স্থান ছিল না। সাধারণ-জন বা massesকে বাদ দিয়া যে রাজনীতিক অধিকার অর্জন সম্ভবপর হইবে না, তাহা রবীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন আমাদের দেশের অনেক খ্যাতিমান নেতার পূর্বে। তখন আমাদের রাজনীতিক সভা-সমিতির কার্য পরিচালিত হইত ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের বাহিরে যে অগণিত দেশবাসী রহিয়াছে, তাহাদিগকে রাজনীতিক নেতা ও কর্মিগণ বিবেচনার মধ্যে আনিতেন

না। এই মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পাবনা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে।

তিনি বলিয়াছেন :—

"আমরা ইংরেজিশিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলে জানি—আপামর সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, একথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরী করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ-আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। আমরা গোড়াগুড়ি বিলাতের হৃদয় হরণের জন্য ছলবল-কৌশলে সাজসরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই—কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্যও যে বহুতর সাধনার আবশ্যক, একথা আমরা মনেও করি নাই।"

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এবং ইহার পূর্বে ও পরে রবীন্দ্রনাথ নানা রচনার মাধ্যমে স্বাদেশিকতা ও স্বাজাতিকতার নব নব বাণী জাতিকে শুনাইয়াছেন। কবিগুরুর সেই সকল বাণীর ভিতর দিয়া যে আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা সুষম ও সুন্দর—উদার ও উন্মুক্ত। ঋষিকবি-ব্যাখ্যাত ভারতীয় জাতীয়তা প্রতীচ্যের জাতীয়তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহাতে ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষের স্থান নাই। ইহার ক্ষেত্র ব্যাপক ও বিশাল। ভারতবাসীর স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিবাৎসল্য বিকশিত হইয়া উঠিবে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রাখিয়া। রবীন্দ্রনাথ বলেন :—

"গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার

মঙ্গল সম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।

"এই উচ্চ ভাব হইতেই আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রাত্যহিক সম্বন্ধ কি বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব ?" ("স্বদেশী সমাজ")

রবীন্দ্রনাথের উক্তি আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে উপনিষদের বাণী। উপনিষদের ঋষি ব্রহ্মবাণী শুনিবার জন্য বিশ্বের মানব-সন্তানকে আহ্বান করিয়াছেন অমৃতের পুত্র বলিয়া—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা···"। হিন্দু-শাস্ত্রে তর্পণের বিধানে এইরূপ নির্দেশ আছে—"যে জলাশয়ের জল সকল প্রাণীর জন্য উৎসর্গীকৃত হয় নাই", তাহার দ্বারা তর্পণ করিবে না। ব্রহ্ম হইতে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত নিখিল বিশ্বের তৃপ্তির জন্য তর্পণকারী জলদান করিয়া থাকেন—"ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।" প্রাচীন ভারতের শিক্ষা—ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা হইতে মনকে মুক্ত রাখিয়া এবং সীমাবদ্ধ স্বার্থের উর্ধ্বে থাকিয়া বিশ্বজনের সুখ-স্বস্তি-স্বাস্থ্য কামনা করিবে। মানব-মঙ্গল-কামনার সেই শাশ্বতী বাণী :—

> "সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ
> সর্বে সন্তু নিরাময়া
> সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু
> মা কশ্চিদ্দুঃখমাপ্নুয়াৎ।"

বিশ্বকবির উদার দৃষ্টিতে যে নব্য ভারতের রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাতে থাকিবে নানা মত ও নানা ভাবের সমন্বয় এবং বিভিন্ন পন্থার সংযোগ সাধন। রবীন্দ্রনাথের মতে—

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—ইহাই

ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না—সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্য ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।" ("স্বদেশী সমাজ")

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত স্বাজাতিকতার আদর্শে যে ভারতবর্ষ গঠিত হইবে, তাহা শুধু হিন্দুর ভারতবর্ষ নহে—তাহা হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানা জাতির ভারতবর্ষ। এমন কি ইংরাজ যদি ভারতবর্ষে ভারতবাসী হইয়া থাকিতে চায়, তাহাকেও স্থান দিবার তিনি পক্ষপাতী। কবি চাহিয়াছেন 'বৃহৎ ভারতবর্ষ' গড়িয়া তুলিতে। এই বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর মতের সহিত রবীন্দ্রনাথের মতের কিছুমাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। আর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার যে পথের সন্ধান তিনি জাতিকে দিয়াছেন, তাহা গান্ধীজীরও পথ। 'গুরুদেব' এই সকল মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে গান্ধীজীর নেতৃত্ব গ্রহণেরও বহু পূর্বে। এই দুই মহামানবের পথ হিংস্রতা ও কৈতবের পথ নহে—প্রেম ও ঋজুতার পথ, অনৃত ও অনর্থের পথ নহে—সত্য ও কল্যাণের পথ। এ পথে জাতির ক্ষয়-ক্ষতি নাই—আছে পূর্ণতা ও ঋদ্ধিলাভ।

'গুরুদেব' বলিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস গড়িয়া উঠিতেছে এ ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এ নয় যে, এদেশে হিন্দুই বড়ো হইবে বা আর কেহ বড়ো হইবে না। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে এক অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে; ইহা অপেক্ষা কোন ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে

হিন্দু মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্তমান বিশেষ আকারটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।

"আমরা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্ত আছি। আমরা তাহার একটা উপকরণ। কিন্তু উপকরণ যদি এই বলিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে থাকে যে, আমরাই চরম, আমরা সমগ্রের সহিত মিলিব না, আমরা স্বতন্ত্র থাকিব, তবে সকল হিসাবেই ব্যর্থ হয়। 'বিরাট রচনার সহিত যে-খণ্ড সামগ্রী কোনো মতেই মিশ খাইবে না, যে বলিবে আমিই টিকিতে চাই, সে একদিন বাদ পড়িয়া যাইবে। যে বলিবে আমি স্বয়ং কিছুই নই, যে-সমগ্র রচিত হইতেছে তাহারই উদ্দেশে আমি সম্পূর্ণভাবে উৎসৃষ্ট, ক্ষুদ্রকে সেই ত্যাগ করিয়া বৃহতের মধ্যে রক্ষিত হইবে। ভারতবর্ষেরও যে-অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিবে না, যাহা কোনো একটা বিশেষ অতীত কালের অন্তরালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অন্য সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনার চারিদিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, ভারত ইতিহাসের বিধাতা তাহাকে আঘাতের পর আঘাতে হয় পরম দুঃখে সকলের সঙ্গে সমান করিয়া দিবেন, নয় অনাবশ্যক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জন করিবেন। কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস নহে, আমরাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য সমাহৃত ; আমরা নিজেকে যদি তাহার যোগ্য না করি, তবে আমরাই নষ্ট হইব।" ('পূর্ব ও পশ্চিম')

কবি-বাঞ্ছিত ভারতবর্ষে "জাতির সহিত জাতির মিলন ঘটিবে।" এখানে বিচ্ছেদ, বিরোধ, বৈপরীত্য ও বহুত্বের ধারা সমন্বয়ের মহাসাগরে লীন হইয়া যাইবে। কবির দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার কল্পনার ভারতবর্ষ একদা রূপায়িত হইয়া উঠিবেই। কবি কহিতেছেন :—

..."নিশ্চয় জানিব এই ভারতবর্ষে যুগযুগান্তরীয় মানব-চিত্তের

সমস্ত আকাঙ্ক্ষাবেগ মিলিত হইয়াছে—এইখানেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞানে মন্থন হইবে, এবং জাতির সহিত জাতির মিলন ঘটিবে। বৈচিত্র্য এখানে অত্যন্ত জটিল, বিচ্ছেদ এখানে অত্যন্ত প্রবল, বিপরীতের সমাবেশ এখানে অত্যন্ত বিরোধসঙ্কুল—এত বহুত্ব, এত বেদনা, এত সংঘাত কোনো দেশেই এত দীর্ঘ কাল বহন করিয়া বাঁচিতে পারিত না—কিন্তু একটি অতি বৃহৎ অতি মহৎ সমন্বয়ের পরম অভিপ্রায়ই এই সমস্ত বিরুদ্ধতাকে ধারণ করিয়া আছে, পরস্পরের আঘাতে কাহাকেও উৎসাদিত হইতে দেয় নাই। এই যে সমস্ত নানা বিচিত্র উপকরণ কাল-কালান্তর ও দেশ-দেশান্তর হইতে এখানে আহরিত হইয়াছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে গেলে আমরা নিজেরাই আহত হইব, তাহার কিছুই করিতে পারিব না।

…"ভারতবর্ষে আমরা মিলিব ও মিলাইব, আমরা সেই দুঃসাধ্য সাধনা করিব, যাহাতে শত্রুমিত্র ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়; যাহা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য, যাহা পবিত্রতার তেজে ক্ষমার বীর্যে, প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে পূর্ণ, আমরা তাহাকে কখনই অসাধ্য বলিয়া জানিব না, তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য করিয়া লইব। দুঃখবেদনার একান্ত পীড়নের মধ্য দিয়াই যাত্রা করিয়া আজ উদার আনন্দে মন হইতে সমস্ত বিদ্রোহভাব দূর করিয়া দিব, জানিয়া এবং না জানিয়া বিশ্বের মানব এই ভারতক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের যে পরমাশ্চর্য মন্দির নানা ধর্ম, নানা শাস্ত্র, নানা জাতির সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই সাঁধনাতেই যোগদান করিব, নিজের অন্তরের সমস্ত শক্তিকে একমাত্র সৃষ্টিশক্তিতে পরিণত করিয়া এই রচনা-কার্যে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব।" ('পথ ও পাথেয়')

রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতা বা স্বাজাতিকতার যে আদর্শ স্বদেশ ও স্বজাতির সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন, তাহা সার্বজাতিকতার মর্যাদা

পাইতে পারে। সেই উদার আদর্শে গঠিত ভারতবর্ষ হইবে,—সর্বভূমির সর্বজনের মিলন-ক্ষেত্র। কবি-মানসে প্রতিভাত এই ভারতবর্ষই আবার নূতন ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে "ভারত-তীর্থ" কবিতার মধ্য দিয়া। তীর্থ দর্শনে যাইয়াও আমরা শুনিতে পাই সেই মিলনেরই বাণী—

"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।"

'ভারত তীর্থ' রচনারও পূর্বে কবি-চিত্তে তাঁহার কল্পনার ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিবার যে সংকল্প জাগে, তাহা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন এই ভাবে—

…"ভারতবর্ষের যে পরম মহিমা সমস্ত কঠোর দুঃখ-সংঘাতের মধ্যে বিশ্বকবির সৃজনানন্দকে বহন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে—ভক্ত সাধকের প্রশান্ত ধ্যাননেত্রে তাহার অখণ্ড মূর্তি উপলব্ধি করিব। চারিদিকের কোলাহল ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে সাধনাকে মহৎ লক্ষ্যের দিকে অবিচলিত রাখিব।"…('পথ ও পাথেয়')

ভারত তীর্থের আচার্যের কণ্ঠেও উদ্‌গীত হইয়াছে :—

"হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।
তপস্যা-বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া,
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে।
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে॥"

স্বাজাতিকতার ওই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই এই তীর্থক্ষেত্রে—"এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে" দাঁড়াইয়া "গীতাঞ্জলির" মহাকবি দেখিতে পাইয়াছেন "পবিত্র ধরিত্রীরে", দেখিয়া

মুগ্ধ হইয়াছেন, বিস্মিত হইয়াছেন! সবাইকে ডাকিয়াছেন দেখিবার জন্য। বিস্মিত কবির জিজ্ঞাসা—

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হোলো হারা।"

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে উচ্চ-নীচ সকলকে সস্নেহ-সমাদরে আহ্বান করিয়াছেন,—ভারত তীর্থে আসিয়া মিলিত হইয়া "মার অভিষেকে" যোগদান করিতে, আর "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে" অভিষেকের "মঙ্গলঘট" ভরিয়া আনিতে।

॥ রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত ॥

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন খাঁটি স্বদেশপ্রেমিক ও স্বজাতিবৎসল। তিনি ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে অন্তরের সহিত ভালোবাসিতেন। সেই ভালোবাসা যে নিখুঁত ও নির্ভাজ ছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলিবে বিশ্বকবির বিরাট জীবনের বিভিন্নমুখী কর্মধারা ও সাধনার মধ্যে। কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছিল স্বাদেশিকতা ও স্বাজাতিকতার পীঠস্থান। ঠাকুর-পরিবারের যোগ্য সন্তান রবীন্দ্রনাথের প্রাণে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রীতির ভাব স্থান পায় কিশোর বয়সে। সেই ভাব বিকাশে কতকটা সহায়তা করিয়াছিল নবগোপাল মিত্রের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেলা বা জাতীয় মেলা। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বজাতীয়গণের প্রাণে জাতীয় ভাব সঞ্চারিত করিয়া তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা। মিত্র মহাশয়ের সেই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় ঠাকুর-পরিবারের সাহায্য ও সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতকের সপ্তম দশকের মধ্যভাগে কিশোর রবি হিন্দু মেলার অধিবেশনে 'হিন্দু মেলার উপহার' শীর্ষক একটি কবিতা মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি করেন। জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা রচনা ও আবৃত্তির এবং সঙ্গীত রচনা ও গাহিবার ব্যবস্থা মেলার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওই সমুদয় কার্যে পরিচালকমণ্ডলী যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। দুই বৎসর পরের (১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের) কথা। কবি তখন কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। সেই বৎসরের হিন্দু মেলার অধিবেশনেও তিনি তাঁহার অন্যতম সহোদর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গী হইয়া যোগ দিয়াছিলেন। কবি

নবীনচন্দ্র সেনও তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। যুবক রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তাঁহার স্বরচিত জাতীয়-ভাব-সমৃদ্ধ কবিতার আবৃত্তি এবং স্বরচিত জাতীয় সঙ্গীত গীত হইতে শুনিয়া নবীনচন্দ্র মুগ্ধ হইলেন! তিনি লিখিয়াছেন :—

…"মহর্ষি দেবেন্দ্রবাবুর পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র এবং রবীন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রবাবু 'দিল্লীর দরবার' সম্পর্কে একটি কবিতা এবং একটি গীত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষছায়ায় দূর্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা এবং গীতটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্র এখনও বালক, তাহার বয়স ষোল কি সতর বৎসরের অধিক হয় নাই। তথাপি তাঁহার কৃতিত্বে আমরা বিস্মিত এবং আর্দ্র হইয়াছিলাম। যখন দেখিলাম বঙ্গের একটি সুকুমারমতি শিশু ভারতের জন্য এরূপ রোদন করিতেছেন, যখন দেখিলাম যে, তাঁহার কোমল হৃদয় পর্যন্ত ভারতের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়াছে, তখন আশাতে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল।"

স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ কৈশোরে ও যৌবনের প্রারম্ভকালেই কতটা গভীর ছিল, তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে মিলিবে। যৌবন-সীমান্ত উত্তীর্ণ হইবার পর অবধি তাঁর দুশ্চর তপস্যার ফল ফলিতে লাগিল। সেই অনুরাগ শতদল পদ্মের মতো বিকশিত হইয়া স্বদেশবাসীকে সুষমায় ও সৌরভে মুগ্ধ ও তৃপ্ত করিল।

ভারতীয় মহাজাতির মুক্তি-সাধনায় মহাকবির দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি জাতীয় ভাবের উন্মেষে ও বিকাশে, মুক্তিকামী জাতির অগ্রগতিতে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক অবদান—প্রবন্ধ, কবিতা, সঙ্গীত ইত্যাদি বিবিধ রচনা মৃতপ্রায় জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার দুঃসাধ্য কার্যে সহায়ক

ছিল। এই প্রবন্ধে আমরা তাঁহার রচিত জাতীয় সঙ্গীতাবলীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রয়াসী হইব। প্রত্যেক জাতির অভ্যুত্থানে জাতীয় সঙ্গীতের একটা বিশিষ্ট দান রহিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় সঙ্গীতের—বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র-রচিত স্বদেশ সঙ্গীতের অবদান অবিস্মরণীয়। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বনাম-খ্যাত সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক সঙ্কলিত ও সিটি বুক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত 'বন্দে মাতরম্' নামক একখানা জাতীয় সঙ্গীতের পুস্তকের ভূমিকায় বঙ্গবিশ্রুত দেশভক্ত ঐতিহাসিক, 'দেশের কথা' প্রণেতা, মারাঠা-বাঙালী পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর লিখিয়াছিলেন :—

"সঙ্গীতের অসীম শক্তি। 'গানাৎ পরতরং নহি'। সঙ্গীতে মানবের চিত্তবৃত্তিনিচয় একতান হয় ও অসীম শক্তিলাভ করে। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় মুমূর্ষু সমাজ-শরীরে নবপ্রাণের সঞ্চার করে। জাতীয়-সঙ্গীত ভিন্ন জাতীয় চিত্তের অবসাদ দূরীভূত হয় না, জাতীয়-ভাব যথোচিত বল-বেগ লাভ করে না।"

তাঁহার ওই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। স্বদেশী যুগে সহস্র সহস্র নরনারীর বিরাট সভায় এক-একটি জাতীয় সঙ্গীত কিরূপ উদ্দীপনা ও উন্মাদনার সৃষ্টি করিত, স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতি-প্রীতির পাবনী ধারায় জনগণের প্রাণকে কি ভাবে আপ্লুত করিয়া দিত, তাহার পরিচয় কত বার পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ় বয়সে ও বার্ধক্যে যে সকল স্বদেশ-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বদেশী যুগে রচিত সঙ্গীতাবলী অধিকতর লোকপ্রিয় হইয়াছে।

বিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্য ভাগে পরাধীন ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন জনমত উপেক্ষা করিয়া বাংলা দেশকে

দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অগ্রগতি রোধ করিতে পারিলে ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে ধ্বংস করা সহজ হইবে, ইহাই ছিল লর্ড কার্জনের ধারণা। বঙ্গভঙ্গ হইতে উদ্ভব হইল বিলাতী পণ্য বর্জন বা বয়কট ও স্বদেশ-জাত দ্রব্য গ্রহণের আন্দোলন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ইহা স্বদেশী আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গ-বিভাগ বাতিল করার রাজকীয় ঘোষণার সঙ্গে উহার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই কালকে 'স্বদেশী যুগ'ও বলা হইয়া থাকে।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট কলিকাতায় যে বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল, সেই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রায় ও সভা-স্থলে রবীন্দ্রনাথের যে কয়েকটি সঙ্গীত সম্মিলিত কণ্ঠে গীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুইটির প্রথম চরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগৎ জনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক
মুখ তুলে আজি চাহ রে।"

* * * *

(২) "তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ,
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ ;
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।"

টাউন হলের প্রতিবাদ-সভা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের তৎকালে রচিত নূতন গান "আমার সোনার বাংলা" বাউল সুরে গীত হইয়াছিল। জাতীয় সঙ্গীতাবলীর মধ্যে এই সঙ্গীতটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর (১৩১২ সনের ২২শে ভাদ্র) তারিখের সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ওই গানটি রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপরে তাঁহার সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" (নব পর্য্যায়) মাসিক পত্রের আশ্বিন (১৩১২ সন) সংখ্যায়ও উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। "সোনার বাংলা" সঙ্গীতের প্রথম দুই চরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায় হায় রে—
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কী দেখেছি মধুর হাসি।"

সঙ্গীতটির শেষ চরণ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাহা এই :—

"ওমা, তোর চরণেতে
দিলেম এই মাথা পেতে—
দে গো তোর পায়ের ধূলা,
সে যে আমার মাণিক হবে।
ওমা, গরিবের ধন যা আছে
তাই দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে—
আমি পরের ঘরে কিনব না আর
ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি॥"

বঙ্গ-বিভাগের সরকারী ঘোষণাকে কার্যে পরিণত করা হইয়াছিল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর—১৩১২ সনের ৩০শে আশ্বিন। রাজনৈতিক কৃত্রিম বিভাগকে অস্বীকার করিয়া বাঙালী জাতির অখণ্ডতাকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য এবং বিভক্ত বাংলার ঐক্য ও সৌভ্রাত্রের যোগ-সূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে ওই দিবস রাখি-বন্ধন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। ইহার উদ্ভাবক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই অনুষ্ঠানের জন্য তিনি রচনা করিলেন একটি প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত। গোটা গানটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান॥

বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান॥

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান॥

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান॥"

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ দিবসে এই সঙ্গীতটি বাংলা দেশের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে গীত হইয়াছিল। বঙ্গ-বিভাগের সরকারী আদেশ রহিত হওয়ার কাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর রাখি-বন্ধন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে উহা গীত হইত।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন খাঁটি বাঙালী। বাংলা ও বাঙালীকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। সে যুগে উদ্বুদ্ধ বাংলা দেশের মধ্য দিয়া তাঁহার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিল স্বদেশ-জননীর অপরূপ রূপ। তাই কবির ভাবোদ্বেল কণ্ঠে গীত হইয়াছে :—

"আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী !
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে !
তোমার দুয়ার আজ খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥"

সেদিন তিনি দেখিতে পাইলেন, মায়ের—

"ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাতে করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।"

দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন ! গাহিলেন :—

"ওগো মা, তোমার কী মূরতি আজি দেখি রে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।"

'দুঃখিনী' মায়ের 'দরিদ্র বেশ' 'মলিন হাসি' সমস্তই বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাই বিস্ময়-বিমুগ্ধ কবির কণ্ঠে শুনিতে পাই :—

"কোথা সে তার দরিদ্র বেশ, কোথা সে তার মলিন হাসি—
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তিরাশি।"

'আনন্দমঠ'-এর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মৃন্ময়ী জন্মভূমির মধ্যে চিন্ময়ী জননীর দর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। সেই দর্শন-লাভই তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছিল 'বন্দে মাতরম্' রচনায়। রবীন্দ্রনাথও মৃন্ময়ী মাতৃভূমির মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন চিন্ময়ী বিশ্বমাতাকে। তাই তিনি বন্দনা করিলেন অনবদ্য সঙ্গীতের ভিতর দিয়া দেশের মাটিকে বিশ্বময়ী বিশ্বমা বলিয়া :—

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্ব মায়ের আঁচল পাতা ॥
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ওই শ্যামলবরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা ॥"

কবি দেশের মাটিকে প্রণাম করিয়া ভক্তি-উদ্বেল কণ্ঠে গাহিলেন :—

"তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা ॥"

বিচিত্র এই ভারতভূমির অনুপম রূপ—"নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল, অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল, অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল" একদা কবি-মানসে স্বপ্নপুরীর সৃষ্টি করিয়াছিল। ভাব-বিহ্বল কবি গাহিলেন :—

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননী জননী ॥"

*　*　*　*　*　*

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন—
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী ॥"

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী। সুকণ্ঠ গায়ক এবং সুর-শিল্পী বলিয়াও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁহার রচিত সঙ্গীতে তিনি নিজেই সুর যোজনা করিতেন। এই কারণে তাঁহার গান শুধু যে রচনার দিক হইতেই চিত্তাকর্ষক হইত তাহা নহে, সুরের দিক দিয়াও প্রাণস্পর্শী হইত। স্বদেশপ্রাণ কবি স্বদেশী যুগে এবং ইহার পূর্বে ও পরে স্বদেশ-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তবে ওই সমুদয়ের বেশীর ভাগই রচিত হইয়াছে সেই সার্থক যুগে—যখন বাঙালীর জাতীয় জীবন প্রাণ-বন্যার প্রবাহে উদ্বেলিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নায়করূপে পুরোভাগে ছিলেন। তৎকালে রচিত সঙ্গীতাবলীর মধ্যে দুইটি জনপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীতের উল্লেখ করিতেছি। ওইগুলির প্রথম চরণ পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইল :—

(১) "নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস, সে পণ তোমার রবেই রবে॥
ওরে মন, হবেই হবে॥"

* * * * * *

(২) "বুকে বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই।
শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস নে ভাই॥"

ভাব-বৈচিত্র্য ও জনপ্রিয়তার দিক দিয়াও রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতের আসন অনেক উচ্চে। প্রত্যেকটি গানে তাঁহার স্বর-যোজনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট; এবং গানের ভাবের উপযোগী সুর তিনি স্বয়ং যোজনা করিতেন। তাঁহার যোজিত সুরের বিশেষত্ব এই যে, উহা যেমন সহজ ও সরল, তেমনই মধুর ও মর্মস্পর্শী। এই সমুদয় কারণে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই লোকচিত্ত আকর্ষণ করিত এবং সমগ্র বাংলা দেশের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, সহস্র কণ্ঠে গীত হইত। নিম্নে তিনটি সঙ্গীতের প্রথম চরণ উদ্ধৃত করিতেছি:—

(১) "আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার॥
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর,
তোমারে করি নমস্কার॥"

(২) "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।"

(৩) "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমন শক্তিমান।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান—
তোমাদের এমন অভিমান।
চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে—
এত বল নাই রে তোমার, রবেনা সেই টান॥"

* * * *

ওই শ্রেণীর আরও একটি জনপ্রিয় গানের প্রথম চরণ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে।
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না॥"

ওই গান কয়টি রচিত হইয়াছিল স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য পর্বে—যখন গর্বান্ধ ক্ষিপ্ত বৈদেশিক রাজপুরুষগণ চণ্ড নীতির নিরঙ্কুশ প্রয়োগে আন্দোলন দমাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছিল।

এইক্ষণ তাঁহার আর একটি জাতীয় সঙ্গীতের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিতেছি। স্বদেশী যুগে রচিত এই সঙ্গীতটি তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সঙ্গীতটি এই ঃ—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়—
ওরে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে॥

যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে ॥

যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে।

স্বদেশী যুগে সহস্র সহস্র লোকের বিরাট জনসভায় দেশভক্ত সুকণ্ঠ গায়ক কর্তৃক ওই অতুলনীয় সঙ্গীতটি ভাবোদ্বেল কণ্ঠে গীত হইবার কালে অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হইতে দেখিয়াছি। ওই সঙ্গীতটি মহাত্মা গান্ধীর জীবনের শেষ দিকে তাঁহার অন্যতম প্রিয় সঙ্গীতরূপে সমাদর লাভ করিয়াছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার পরে গান্ধীজীর নোয়াখালী পরিক্রমা কালে প্রত্যেক জনসভায় উহা গীত হইত। কবি-গুরুর ওই সঙ্গীতটির মধ্য দিয়া যে একটা শাশ্বত ভাবের বিকাশ হইয়াছে, তাহাই উহাকে অক্ষয় করিয়া রাখিবে। বাংলার স্বদেশী যুগের এই অনুপম সঙ্গীতটি শাশ্বতী বাণীর বাহক বলিয়া যুগে-যুগে সর্বত্র সমাদৃত হইবে।

মুক্তি-অভিযানের অভিযাত্রী বাহিনীর উদ্দেশ্যে অভী মন্ত্রের উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথের বাণী—

"সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মান।
মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয় ॥"

এই সঙ্গীতেরই আর একটি পদ—

"দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়, নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়॥"

স্বাধীন ভারতের দুইটি জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' এবং 'জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা' দুই জন বাঙ্গালী কবির রচনা, একটি বঙ্কিমচন্দ্রের এবং আর একটি রবীন্দ্রনাথের। ইহা বাংলা ও বাঙ্গালীর পক্ষে পরম গর্ব ও গৌরবের বিষয়।

স্বদেশভক্ত কবি তাঁহার জন্মভূমি ভারতবর্ষকে তীর্থ বলিয়া জানিতেন; এবং সেই ভক্তিপূত মনোভাবই কবিকে প্রেরণা দিয়াছে 'ভারততীর্থ' সঙ্গীত রচনায়। ভক্ত কবির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের উদ্বোধন বাণী :—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু' বাহু বাড়ায়ে নমি নর দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তারে।"

মহাকবির দৃষ্টিতে জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রতিফলিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি জাতীয় জীবনের চরম সংকটকালেও জাতিকে শুনাইয়াছেন অভয় বাণী, মুক্তি-সাধকের সংশয়াকুল চিত্তে জাগাইয়াছেন আশা, দুর্যোগের অন্ধকার রজনীতে আলোকবর্তিকা হস্তে পথের সন্ধান দিয়াছেন মুক্তি-পথের নিঃসঙ্গ একক পথচারীকে। তাঁহার কণ্ঠে আমরা শুনিয়াছি :—

"আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না॥
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে—
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না॥"

আরও শুনিয়াছি :—

"ধর্ম আমার রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে—

বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না ॥"

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের রচিত এমন একটি অনবদ্য জাতীয় সঙ্গীতের প্রসঙ্গে আসিতেছি—যাহা প্রাণকে সিক্ত করিয়া দেয় স্বদেশ-ভক্তির পূত ধারায়। আন্দামানের নির্জন কারাকক্ষে আবদ্ধ বিপ্লবী বাঙ্গালী মুক্তি-সাধক প্রেরণা পাইয়াছে, শান্তি পাইয়াছে সেই গানটি গাহিয়া ও শুনিয়া। সেই সঙ্গীতের বিস্ময়কর শক্তি বন্দী-জীবনের দুঃসহ লাঞ্ছনা-নির্যাতনের জ্বালা জুড়াইয়া দিয়াছে অল্পকাল মধ্যে। সঙ্গীতটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।

সার্থক জনম মা গো, তোমায় ভালবেসে ॥

জানি নে তোর ধন-রতন আছে কি না রাণীর মতন,

শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥

কোন্ বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,

কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।

আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,

ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥"

———

॥ স্বদেশী-যুগোত্তর কালের রবীন্দ্রনাথ ॥

স্বদেশ ও স্বজাতি দাসত্ব-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্ব-সভায় গৌরবের আসনে আসীন হউক—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রাণের কামনা। স্বদেশী যুগের পরবর্তী কালের রচনামালা ও কার্যাবলীর মধ্যেও সেই কামনার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। দেশ ও জাতির চরম সংকটের দিনেও তাঁহাকে আমরা দেখিয়াছি বিপন্ন দেশবাসীর পার্শ্বে আসিয়া এক সারিতে দাঁড়াইতে। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪ খ্রী—১৯১৮ খ্রী) কালে ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের উচ্ছেদ-কল্পে বৃটিশ সরকার উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। সেই আন্দোলনে বাংলা দেশই ছিল পুরোভাগে। তদ্দরুণ নিগ্রহ-নীতির ঝড়-তুফান বাংলার উপর দিয়াই বহিয়া গিয়াছে উদ্দাম বেগে। ভারত রক্ষা আইনে শত শত বাঙালী দেশসেবককে বিনা বিচারে অন্তরণে আটক করা হইল; এবং ৩নং রেগুলেশুনের বলে অনেককে রাজবন্দী-রূপে কারাগারে আবদ্ধ করা হইল।

দেশের সেই জটিল পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথকে আমরা নীরব ও নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখি নাই। ভারতবাসীর আত্মকর্তৃত্ব লাভের স্বাভাবিক ইচ্ছাকে রাজদণ্ড দিয়া নিশ্চিহ্ন করা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া রাজপক্ষকে তিনি সতর্ক করিয়া দিলেন। ওই নিরঙ্কুশ দমননীতি প্রয়োগের ফল যে রাজা ও প্রজা উভয়ের পক্ষেই ভয়াবহ হইবে, তাহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া দিতেও তিনি ভুলেন নাই। বিপ্লবপন্থী স্বদেশীয়গণকে অসত্য, অন্যায় ও অধর্মের পথ ছাড়িয়া জন্মভূমির মুক্তি সাধনায় সত্য, ন্যায় ও ধর্মের পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে আহ্বান

করিলেন। তাঁহাদের অনুসৃত পন্থায় যে বাঞ্ছিত ফল মিলিবে না, তাহাও তিনি বলিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

…"বিনা বিচারে শত শত লোককে বন্দী করার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে একখানি ছোটো চিঠি লিখিয়াছিলাম। ইহাতে ভারতজীবী কোনো ইংরেজি কাগজ আমাকে মিথ্যুক ও extremist বলিয়াছিল। ইহারা ভারতশাসনের তক্‌মাহীন সচিব, সুতরাং আমাদিগকে সত্য করিয়া জানা ইহাদের পক্ষে অনাবশ্যক; অতএব আমি ইহাদিগকে ক্ষমা করিব। এমন কি, আমাদের দেশের লোক যাঁরা বলেন আমার পদ্যেও অর্থ নাই, গদ্যেও বস্তু নাই, তাঁদের মধ্যেও যে দুই-একজন ঘটনাক্রমে আমার লেখা পড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্তত এ কথাটুকু কবুল করিতেই হইবে যে, স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি অতিশয়-পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি। আমি এই কথাই বলিয়া আসিতেছি যে, অন্যায় করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহাতে কখনোই শেষ পর্যন্ত ফলের দাম পোষায় না, ঋণটাই ভয়ংকর ভারি হইয়া উঠে। সে যাই হোক, দিশি বা বিলিতি যে-কোনো কালিতেই হোক-না আমার নিজের নামে লাঞ্ছনাতে আমি ভয় করিব না। আমার যেটা বলিবার কথা সে এই যে, অতিশয়-পন্থা বলিতে আমরা এই বুঝি, যে পন্থা না ভদ্র, না বৈধ, না প্রকাশ্য; অর্থাৎ সহজ পথে ফলের আশা ত্যাগ করিয়া অপথে বিপথে চলাকেই একস্‌ট্রিমিজম্ বলে। এই পথটা যে নিরতিশয় গর্হিত সে কথা আমি জোরের সঙ্গেই নিজের লোককে বলিয়াছি; সেইজন্যই আমি জোরের সঙ্গেই বলিবার অধিকার রাখি যে, একস্‌ট্রিমিজম্ গবর্ণমেণ্টের নীতিতেও অপরাধ। আইনের বাঁধা রাস্তা বলিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে গম্যস্থানে পৌঁছিতে ঘুর পড়ে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বেলজিয়মের বুকের উপর দিয়া সোজা হাঁটিয়া রাস্তা সংক্ষেপ করার মতো একস্‌ট্রিমিজম্ কাহাকেও শোভা পায় না।

"ইংরেজিতে যাকে 'শর্টকাট্' বলে আদিমকালের ইতিহাসে তাহা চলিত ছিল। 'লে আও উস্‌কো শির লে আও' এই প্রণালীতে গ্রন্থি খুলিবার বিরক্তি বাঁচিয়া যাইত, এক কোপে গ্রন্থি কাটা পড়িত। য়ুরোপের অহংকার এই যে, সে আবিষ্কার করিয়াছে, এই সহজ প্রণালীতে গ্রন্থি কাটা পড়ে বটে কিন্তু মালের গুরুতর লোকসান ঘটে। সভ্যতার একটা দায়িত্ব আছে, সকল সংকটেই সে দায়িত্ব তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। শাস্তি দেওয়ার মধ্যে একটা দারুণতা অনিবার্য বলিয়াই শাস্তিটাকে ন্যায়বিচার-প্রণালীর ফিল্‌টারের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ ও পক্ষপাত-পরিশূন্য করিয়া সভ্যসমাজ তবে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে। তাহা না হইলেই লাঠিয়ালের লাঠি এবং শাসনকর্তার ন্যায়দণ্ডের মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত হইতে থাকে।"

রবীন্দ্রনাথ বিপ্লববাদী দেশসেবকগণের উদ্দেশ্যে যে প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বাংলাদেশের একদল বালক ও যুবক স্বদেশের সঙ্গে স্বদেশীর সত্য যোগ সাধনের বাধা অতিক্রমের যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহার জন্য আমরা লজ্জিত আছি। আরো লজ্জিত এই জন্যে যে, দেশের প্রতি কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদ-সাধন করায় অকর্তব্য নাই, এ কথা আমরা পশ্চিমের কাছ হইতেই শিখিয়াছি। পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা এবং পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি পশ্চিম সোনার সহিত খাদ মিশানোর মতো মনে করেন, মনে করেন ওটুকু না থাকিলে সোনা শক্ত হয় না। আমরা শিখিয়াছি যে, মানুষের পরমার্থকে দেশের স্বার্থের উপরে বসাইয়া ধর্ম লইয়া টিক্‌টিক্ করিতে থাকা মূঢ়তা, দুর্বলতা, ইহা সেণ্টিমেণ্টালিজম্—বর্বরতাকে দিয়াই সভ্যতাকে এবং অধর্মকে দিয়াই ধর্মকে মজবুত করা চাই। এমনি করিয়া আমরা যে কেবল অধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছি তাহা নহে,

আমাদের গুরুমশায়দের যেখানে বীভৎসতা, সেই বীভৎসতার কাছে মাথা হেঁট করিয়াছি।”

ওই বিষয়ে তাঁহার অভিমত আরও পরিস্ফুট হইয়াছে নিম্নলিখিত উক্তির মধ্য দিয়া :—

“ · বড়ো আশা করিয়াছিলাম, দেশে যখন দেশভক্তির আলোক জ্বলিয়াছে তখন আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে মহৎ তাহাই উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে; আমাদের যাহা যুগসঞ্চিত অপরাধ তাহা আপন অন্ধকার কোণ ছাড়িয়া পালাইয়া যাইবে; দুঃসহ নৈরাশ্যের পাষাণস্তর বিদীর্ণ করিয়া অক্ষয় আশার উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিবে এবং দুরূহ নিরুপায়তাকেও উপেক্ষা করিয়া অপরাহত ধৈর্য এক এক পা করিয়া আপনার রাজপথ নির্মাণ করিবে; নিষ্ঠুর আচারের ভারে এদেশে মানুষকে মানুষ যে অবনত অপমানিত করিয়া রাখিয়াছে, অকৃত্রিম প্রীতির আনন্দময় শক্তির দ্বারা সেই ভাবকে দূর করিয়া সমস্ত দেশের লোক একসঙ্গে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে এ কী হইল? দেশভক্তির আলোক জ্বলিল, কিন্তু সেই আলোতে এই কোন্ দৃশ্য দেখা যায়—এই চুরি, ডাকাতি, গুপ্তহত্যা? দেবতা যখন প্রকাশিত হইয়াছেন তখন পাপের অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার পূজা? যে দৈন্য, যে জড়তায় এতকাল আমরা পোলিটিকাল ভিক্ষাবৃত্তিকেই সম্পদ লাভের সদুপায় বলিয়া কেবল রাজদরবারে দরখাস্ত লিখিয়া হাত পাকাইয়া আসিয়াছি, দেশপ্রীতির নব বসন্তেও সেই দৈন্য, সেই জড়তা, সেই আত্ম-অবিশ্বাস পোলিটিকাল চৌর্যবৃত্তিকেই রাতারাতি ধনী হইবার একমাত্র পথ মনে করিয়া সমস্ত দেশকে কলঙ্কিত করিতেছে না? এই চোরের পথ আর বীরের পথ কোনো চৌমাথায় একত্র আসিয়া মিলিবে না। য়ুরোপীয় সভ্যতায় এই দুই পথের সম্মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা ভ্রম করি, কিন্তু বিধাতার

দরবারে এখনো পথের বিচার শেষ হয় নাই সেকথা মনে রাখিতে হইবে। আর বাহ্য ফললাভই যে চরম লাভ একথা সমস্ত পৃথিবী যদি মানে তবু ভারতবর্ষ যেন না মানে—বিধাতার কাছে এই বর প্রার্থনা করি, তারপর পোলিটিকাল মুক্তি যদি পাই তো ভালো, যদি না পাই তবে তার চেয়ে বড়ো মুক্তির পথকে কলুষিত পলিটিক্সের আবর্জনা দিয়া বাধাগ্রস্ত করিব না।"

বিপ্লববাদী দলের অনুসৃত পন্থা রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত না হইলেও তাঁহাদের স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রীতির গভীরতা সম্বন্ধে তাঁহার কোনো সংশয় ছিল না। তাঁহাদের মধ্যে তিনি এমন এক শ্রেণী বিপ্লবীর সন্ধান পাইয়াছিলেন, যাঁহারা ওই ভ্রান্ত পথ ধরিয়া না চলিলে স্বদেশ ও স্বজাতির যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেন। এই সমুদয় বিপ্লবীকে তিনি প্রাণে প্রাণে ভালোবাসিতেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"কিন্তু একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশভক্তির আলোকে বাংলাদেশে কেবল যে চোর-ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনো দিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয় বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্নমেণ্টের চাকরি বা রাজসম্মানের আশা নাই তাহা নহে, ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের সঙ্গেও বিরোধে এ রাস্তা কণ্টকিত। আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে, বাংলাদেশে এই ধনমানহীন সংকটময় দুর্গম পথে তরুণ পথিকের অভাব নাই। উপরের দিক হইতে ডাক আসিল, আমাদের যুবকেরা সাড়া দিতে দেরি করিল না; তাহারা মহৎ ত্যাগের উচ্চ শিখরে নিজের ধর্ম-বুদ্ধির সম্বল মাত্র লইয়া পথ কাটিতে কাটিতে চলিবার জন্য দলে দলে প্রস্তুত হইতেছে।

ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্ত পত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই; ছোটো ইংরেজ ইহাদের শুভ সংকল্পকে ঠিক মতো বুঝিবে কিংবা হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিবে, এ দুরাশাও ইহারা মনে রাখে নাই। অন্য সৌভাগ্যবান দেশে, যেখানে জনসেবার ও দেশসেবার বিচিত্র পথ প্রশস্ত হইয়া দিকে দিকে চলিয়া গেছে, যেখানে শুভ ইচ্ছা এবং শুভ ইচ্ছার ক্ষেত্র এই দুইয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ যোগ আছে, সেইখানে এই রকমের দৃঢ় সংকল্প আত্মনির্ভরশীল বিষয়বুদ্ধিহীন কল্পনাপ্রবণ দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ।"

তারপর রবীন্দ্রনাথ বিদেশী সরকারের বেপরোয়া দলন-নীতির তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। সেই নীতি যে ইংরেজের মতো একটা সভ্য প্রগতিশীল জাতির পক্ষে দূষণীয়, তাহাও তিনি বলিয়া দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

"আদিম কালের বা এখনকার কালের যে-কোনা রাজা বা রাজার আমলা এই শ্রেণীর জীবনবান ছেলেদের শাসন করিয়া, দলন করিয়া, দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অসাড় করিয়া দিতে পারে। ইহাই সহজ, কিন্তু ইহা ভদ্র নয়, এবং আমরা শুনিয়াছি, ইহা ঠিক ইংলিশ নহে। যারা নিরপরাধ অথচ মহৎ, অথবা মহৎ উৎসাহের ক্ষণিক বিকারে যারা পথ ভুল করিয়াছে, যারা উপরে চড়িতে গিয়া নীচে পড়িয়াছে এবং অভয় পাইলেই যারা সে পথ হইতে ফিরিয়া একদিন জীবনকে সার্থক করিতে পারিত, এমন সকল ছেলেকে সন্দেহ মাত্রের 'পরে নির্ভর করিয়া চিরজীবনের মতো পঙ্গু করিয়া দেওয়ার মতো মানব জীবনের এমন নির্মম অপব্যয় আর কিছুই হইতে পারে না। দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিশের গুপ্ত দলনের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া—এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি? এ-যে পাপকে হীনতাকে রাজপেয়াদার তকমা পরাইয়া দেওয়া। যার ক্ষেত

সে কপাল চাপড়াইয়া হায় হায় করিয়া মরে, আর যার মহিষ সে বুক ফুলাইয়া বলে—বেশ হইয়াছে, একটা আগাছাও আর বাকি নাই।"

উদ্ধৃতি দিয়াছি রবীন্দ্রনাথের ১৩২৪ ভাদ্রে (১৯১৭ খ্রী) লিখিত 'ছোটো ও বড়ো' শীর্ষক সন্দর্ভ হইতে। ওই বৎসর রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নামে আর একটি সুচিন্তিত রাজনীতিক প্রবন্ধ লিখিলেন। সেই সন্দর্ভে তিনি ভারতবাসীকে 'আত্মকর্তৃত্বের' ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখার জন্য শাসন-কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধি বিধানে এই কথাটা যে দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এইজন্য যে দেশের মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের 'পরে অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড়ো কারখানা খোলা হইয়াছে।

"আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন, 'তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না।'

"আর যাই হোক, মনু-পরাশরের এই আওয়াজটা ইংরেজি গলায় ভারি বেসুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সহজ সুরের কথা। আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্বনাশ নয় স্বাধীন কর্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁত নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয়, তবে তার চেয়ে না হয় ভুলই করিলাম।"

"আমার বলিবার আরো কথা আছে। কর্তৃপক্ষদের এ কথাও স্মরণ করাইতে পারি যে, আজ তোমরা মসৃণ ভূতলের মোটর গাড়ি চালাইতেছ, কিন্তু একদিন রাত থাকিতে যখন গোরুর গাড়িতে যাত্রা শুরু হইয়াছিল তখন খাল-খন্দর মধ্য দিয়া চাকা দুটোর আর্তনাদ ঠিক জয়ধ্বনির মতো শোনাইত না। পার্লামেণ্ট বরাবরই ডাইনে বাঁয়ে প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া এক নজির হইতে আর এক নজিরের আইন কাটিতে কাটিতে আসিয়াছে, গোড়াগুড়িই ষ্টিমরোলার-টানা পাকা রাস্তা পায় নাই। কত ঘুষঘাষ, ঘুষাঘুষি, দলাদলি, অবিচার এবং অব্যবস্থার মধ্য দিয়া সে হেলিয়া হেলিয়া চলিয়াছে। কখনো রাজা, কখনো গির্জা, কখনো জমিদার, কখনো বা মদওয়ালারও স্বার্থ রহিয়াছে। এমন এক সময় ছিল সদস্যরা যখন জরিমানা ও শাসনের ভয়েই পার্লামেণ্টে হাজির হইত।"

শূন্যগর্ভ যুক্তি দেখাইয়া কিংবা ভুয়া অজুহাতে ভারতবাসীকে আত্মকর্তৃত্বের অধিকার দানে বিলম্ব করিলে অন্যায় হইবে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন। আত্মকর্তৃত্ব পাইলে জাতি ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়াই স্বকীয় পথ বাছিয়া লইবে এবং পড়িতে পড়িতেই চলিতে শিখিবে, ইহাও তিনি রাজপক্ষকে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"আত্মকর্তৃত্বের চির সচলতার: বেগে মানুষ ভুলের মধ্য দিয়াই ভুলকে কাটায়, অন্যায়ের গর্তে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে ওঠে। এইজন্য মানুষকে পিছমোড়া বাঁধিয়া তার মুখে পায়সান্ন তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে অন্ন উপার্জনের চেষ্টায় উপবাসী হইতে দেওয়াও ভালো।"

আত্মকর্তৃত্বের অধিকারী হইলে জাতির প্রগতি যে সুনিশ্চিত, তাহা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন দৃঢ়তার সহিত। তিনি লিখিয়াছেন :—

"রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্বে কেবল যে সুব্যবস্থা বা দায়িত্ববোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড়ো হয়। কেবল পল্লীসমাজে বা ছোটো ছোটো সামাজিক শ্রেণী-বিভাগে যাদের মন বদ্ধ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকার পাইলে তবেই মানুষকে বড়ো পরিধির মধ্যে দেখিবার তারা সুযোগ পায়। এই সুযোগের অভাবে প্রত্যেক মানুষ মানুষ-হিসাবে ছোটো হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে যখন মনুষ্যত্বের বৃহৎ ভূমিকার উপরে আপন জীবনকে না ছড়াইয়া দেখে তখন তার চিন্তা, তার শক্তি, তার আশা ভরসা সমস্তই ছোটো হইয়া যায়। মানুষের এই আত্মার খর্বতা তার প্রাণনাশের চেয়ে ঢের বেশি বড়ো অমঙ্গল। ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। অতএব ভুলচুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব; দোহাই তোমার, আমার এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমার চলার দিকে বাধা দিয়ো না।"

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে 'নোবেল' প্রাইজ পাইলেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রাচ্য দেশে তিনিই সর্বপ্রথম এই আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করিলেন। পরের বৎসরই বৃটিশ সরকার তাঁহাকে নাইট্ হুড্ (স্যার উপাধি) দিয়া সম্মানিত করিলেন। ইহার বৎসর পাঁচেক পরে গান্ধীজীর নেতৃত্বে রৌলট্ য়্যাক্ট্ এর বিরুদ্ধে সারা ভারতে প্রতিবাদ আন্দোলন আরম্ভ হইল। পাঞ্জাবে সেই আন্দোলন এমন আকার ধারণ করিল যে, উহাকে দমাইবার জন্য জারী হইল সামরিক আইন। তৎকালীন ছোট লাট স্যার মাইকেল ওডায়ার সামরিক আইন প্রয়োগের ভার দিলেন জেনারেল ডাইয়ারের উপর। লোকপ্রিয় জাতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে কয়েক জনকে বিনা বিচারে কারাবদ্ধ করা হইল এবং সামরিক কর্মচারীদের হাতে বহু পাঞ্জাববাসী অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক

জনসভায় সমবেত প্রায় দশ সহস্র নরনারীর উপর জেনারেল ডাইয়ারের আদেশে সৈন্যগণ গুলী চালাইল। সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে, ৩৭৯ জন নিহত হইয়াছে, আহতের সংখ্যাও অনেক। তিন-চার সপ্তাহ ধরিয়া সামরিক আইন মতে পাঞ্জাবে সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ ছিল। কোনো গোপন সূত্রে শান্তিনিকেতনে সেই ভয়াবহ অমানুষিক কাণ্ডের সংবাদ পৌঁছিলে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত হইয়া পড়েন।

পরদিন ২৭শে মে তিনি দুঃসহ মানসিক অশান্তি ও অন্তর্জ্বালা লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। ৩০শে মে পাঞ্জাবের পৈশাচিক কাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট্‌হুড্‌ ত্যাগ করিয়া ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে ইংরেজিতে পত্র লিখিয়া পাঠান। পয়লা জুন দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে সেই পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রের মর্ম এই :—

স্থানীয় উপদ্রব দমনার্থ পাঞ্জাব সরকারের অনুসৃত জঘন্য পন্থা আমাদের নিকট কঠোর আঘাতের সঙ্গে প্রকটিত করিল যে, ভারতে বৃটিশ সরকারের প্রজা হিসাবে আমরা কিরূপ অসহায়। যে আত্যন্তিক নির্মমতার সহিত হতভাগ্য লোকদের শাস্তি বিধান হইয়াছে এবং সেই শাস্তি যে ভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত কোনো সভ্য গবর্মেণ্টের ইতিহাসে নাই। সেই সময় আজ উপস্থিত, যখন সম্মানের তক্‌মা আমাদের অবমাননার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের লজ্জাকে জ্বলন্ত করিয়া তুলিয়াছে। আমি আমার নিজের পক্ষে এরূপ ইচ্ছা করি যে, আমার বিশেষ সম্মানের যাবতীয় নিদর্শন পরিহার করিয়া আমার দেশবাসীগণের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াই—যাহারা সাধারণ জন বলিয়া মানুষের অযোগ্য অবমাননা ভোগ করিতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত কার্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাঁহার মমত্ববোধ কিরূপ খাঁটি। স্বজাতির প্রতি অবমাননা

তাঁহাকে শেলের মতো বিঁধিত। স্বদেশবাসীর লাঞ্ছনা তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত বর্বরোচিত কাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট্হুড ত্যাগ এবং সেই উপলক্ষ্যে বড়লাটকে লিখিত ঐতিহাসিক পত্রখানা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে।

দীর্ঘজীবনের শেষাংশেও নানা রচনার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তা প্রকাশ পাইয়াছে। য়ুরোপ-আমেরিকায় ভ্রমণকালে ওই সকল দেশের সচ্ছলতা ও ঐশ্বর্য তাঁহার মনে জাগাইয়াছে ভারতের অভাব ও দারিদ্র্যের শোচনীয় চিত্র! বিদেশ হইতে লিখিত পত্রাবলীতে উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলিবে। স্বদেশ ও স্বজাতির যাবতীয় জটিল ও কঠিন সমস্যা সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন; এবং তৎ-সমুদয়ের সমাধানের পথেরও সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা তাঁহাকে বিশেষরূপে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়ে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। একটি সন্দর্ভে তিনি লিখিয়াছেন :—

"নানা উপলক্ষ্যে এবং বিনা উপলক্ষ্যে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ-আলাপ চাই। যদি আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তা হলেই দেখতে পাব, মানুষ ব'লেই মানুষকে আপন ব'লে মনে করা সহজ। যাদের সঙ্গে মেলামেশা নেই তাদের সম্বন্ধেই মত প্রভৃতির অনৈক্য অত্যন্ত কড়া হয়ে ওঠে, বড়ো হয়ে দেখা দেয়। যখনই পরস্পর কাছাকাছি আনাগোনার চর্চা হতে থাকে তখনই মত পিছিয়ে পড়ে মানুষ সামনে এগিয়ে আসে। শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো প্রভেদ অনুভব করি নি, এবং সখ্য ও স্নেহসম্বন্ধ-স্থাপনে লেশমাত্র বাধা ঘটেনি। যে-সকল গ্রামের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধ তার মধ্যে মুসলমান গ্রাম

আছে। যখন কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা যুক্ত-সহযোগে কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে চলেছে, তখন বোলপুর-অঞ্চলে মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করা হয়েছিল যে, হিন্দুরা মসজিদ ভেঙে দেবার সংকল্প করছে। এই সঙ্গে কলকাতা থেকে গুণ্ডার আমদানিও হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় মুসলমানদের শান্ত রাখতে আমাদের কোনো কষ্ট পেতে হয় নি, কেননা তারা নিশ্চিত জানত আমরা তাদের অকৃত্রিম বন্ধু।

"আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোর্‌বানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত বলে মনে করি নি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে, তারা তখনই তা মেনে নিলে। আমাদের সেখানে এ পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটে নি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন।

"একথা আশা করাই চলে না যে, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্মকর্মের মত বিশ্বাসের ভেদ একেবারেই ঘুচতে পারে। তবুও মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা করতেই হবে, আমাদের মধ্যে মিল হবে। পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে মিল আপনিই সহজ হতে পারবে। সঙ্গের দিক থেকে আজকাল হিন্দু মুসলমান পৃথক হয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে, মনুষ্যত্বের মিলটাকে দিয়েছে চাপা। আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানের ত্রুটি বিচারটা থাক্—আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্যে যেন লজ্জা স্বীকার করি।"

যে সন্দর্ভ হইতে উদ্ধৃতি দিলাম তাহা লিখিত হইয়াছিল ১৩৩৮

সালের শ্রাবণে ইংরেজি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। ওই প্রবন্ধটির এক স্থলে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"রাষ্ট্রিক মহাসন-নির্মাণের চেয়ে রাষ্ট্রিক মহাজাতি-সৃষ্টির প্রয়োজন আমাদের দেশে অনেক বড়ো, একথা বলা বাহুল্য। সমাজে ধর্মে ভাষায় আচারে আমাদের বিভাগের অন্ত নেই। এই বিদীর্ণতা আমাদের রাষ্ট্রিক সম্পূর্ণতার বিরোধী ; কিন্তু তার চেয়ে অশুভের কারণ এই যে, এই বিচ্ছেদে আমাদের মনুষ্যত্বসাধনার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। মানুষে মানুষে কাছাকাছি বাস করে তবু কিছুতে মনের মিল হয় না, কাজের যোগ থাকে না, প্রত্যেক পদে মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়, এটা বর্বরতার লক্ষণ। অথচ আমরা যে আত্ম-শাসনের দাবি করছি সেটা তো বর্বরের প্রাপ্য নয়। যাদের ধর্মে সমাজে প্রথায়, যাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে এমন একটা মজ্জাগত জোড়-ভাঙানো দুর্যোগ আছে যে তারা কথায় কথায় একখানাকে সাতখানা করে ফেলে, সেই ছত্রভঙ্গের দল ঐকরাষ্ট্রিক সত্তাকে উদ্ভাবিত করবে কোন যন্ত্রের সাহায্যে ?

"যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে ?"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তায় 'লোক-সাধারণ' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এককালে আমাদের রাজনীতিক নেতারা ওই শ্রেণীর দেশবাসীকে স্বদেশের হিতকর কোনো অনুষ্ঠানেই ডাকিতেন না ; তাঁহাদের আচরণে এমনই ঔদাসীন্য ছিল যে, মনে হইত যেন

ওই সকল সাধারণ জন এই দেশের কেহ নহে। দেশের অগ্রগতি সাধন হইবে কেবল ভদ্রজনের দ্বারাই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণাও তাঁহারা পোষণ করিতেন। রবীন্দ্রনাথ 'লোকহিত' সন্দর্ভে লিখিয়াছেন :—

"আমাদের দেশে লোক সাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান দিতেও পারে না। আমরা তাহাদিগকে ইংরেজি বই পড়িয়া জানিব এবং অনুগ্রহ করিয়া জানিব, সে জানায় তাহারা কোনো জোর পায় না, ফলও পায় না। তাহাদের নিজের অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একলার দুঃখ যে একটি বিরাট দুঃখের অন্তর্গত, এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। তখন সমাজ দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে সেই সমস্যার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত। পরের ভাবনা ভাবা তখনই সত্য হয়, পর যখন আমাদিগকে ভাবাইয়া তোলে। অনুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁকে।

"আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজপুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে; ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে। আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি, প্রজাকে অনায়াসে অতিষ্ঠ করিতে পারি, গরীব মূর্খকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি; নিম্নতনদের সহিত ন্যায় ব্যবহার করা, মানহীনদের প্রতি শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার 'পরে নির্ভর করে, অপর পক্ষে শক্তির 'পরে নহে—এই নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীদের শক্তিশালী করা। সেই শক্তি দিতে গেলেই

তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে—সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো।"

স্বদেশী-যুগোত্তর কালে রবীন্দ্রনাথের লিখিত 'স্বরাজ-সাধন,' 'চরকা', 'কন্‌গ্রেস', 'রায়তের কথা' 'সত্যের আহ্বান,' 'সমস্যা' ইত্যাদি প্রবন্ধাবলীতে তাঁহার স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রীতির নিদর্শন আছে। ওই সমুদয়ের মধ্য দিয়া তিনি দেশের তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিরও আলোচনা করিয়াছেন। একটি সন্দর্ভ হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"বঙ্গবিভাগের আন্দোলনের পরে এবার দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার পরিমাণ আরো অনেক বড়ো ; সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তার প্রকাশ। বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিকাল নেতারা ইংরেজী-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান নি, কেন না তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজি-ইতিহাস পড়া একটা পুঁথিগত দেশ। সে দেশ ইংরেজী ভাষায় বাষ্প রচিত একটা মরীচিকা, তাতে বার্ক গ্লাড্‌স্টোন ম্যাটসিনি গ্যারিবাল্‌ডির অস্পষ্ট মূর্তি ভেসে বেড়াত। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায় নি। এমন সময়ে মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহু কোটি গরীবের দ্বারে—তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যিকার জিনিস, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এইজন্যে তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আত্মীয় করে আর কে দেখেছে? আত্মার মধ্যে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শমাত্রে। সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধ দ্বারে যে-মুহূর্তে এসে দাঁড়ালো অমনি তা খুলে গেল। কারও মনে আর

কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে সত্য জেগে উঠল। চাতুরি দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে নীতি বন্ধ্যা, অনেক দিন থেকে এই শিক্ষার দরকার ছিল। সত্যের যে কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি; কিন্তু চাতুরি হচ্ছে ভীরু ও দুর্বলের সহজ ধর্ম, সেটাকে ছিন্ন করতে হলে তার চামড়া কেটে ছিন্ন করতে হয়। সেইজন্যে আজকের দিনে দেশের অনেক বিজ্ঞ লোকেই মহাত্মার চেষ্টাকেও নিজেদের পোলিটিকাল জুয়োখেলার একটা গোপন চালেরই সামিল করে নিতে চান। মিথ্যায় জীর্ণ তাঁদের মন সেই কথাটা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, প্রেমের দ্বারা দেশের হৃদয়ে এই যে প্রেম উদ্‌বেলিত হয়েছে এটা একটা অবাস্তব বিষয় নয়—এইটেই মুক্তি, এইটেই দেশের আপনাকে পাওয়া; ইংরেজ দেশে আছে কি নেই এর মধ্যে সে কথার কোনো জায়গাই নেই। এই প্রেম হল স্বপ্রকাশ, এই হচ্ছে হাঁ; কোনো না' এর সঙ্গে এ তর্ক করতে যায় না, কেমনা তর্ক করবার দরকারই থাকে না।

"প্রেমের ডাকে ভারতবর্ষের হৃদয়ের এই যে আশ্চর্য উদ্‌বোধন, এর কিছু সুর সমুদ্রপারে আমার কানে গিয়ে পৌঁচেছিল। তখন বড়ো আনন্দে এই কথা আমার মনে হয়েছিল যে, এইবার এই উদ্‌বোধনের দরবারে আমাদের সকলেরই ডাক পড়বে, ভারতবাসীর চিত্তে শক্তির যে বিচিত্ররূপ প্রচ্ছন্ন আছে সমস্তই প্রকাশিত হবে। কারণ, আমি একেই আমার দেশের মুক্তি বলি; প্রকাশই হচ্ছে মুক্তি।"

সুভাষচন্দ্র বসুর স্বদেশানুরাগ, স্বজাতিপ্রীতি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার অতুলনীয় ত্যাগ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বাংলার এই উদীয়মান নেতাকে তিনি অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন। 'জনপ্রেম' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

"আজ আমি জানি, বাংলা দেশের জননায়কের প্রধান পদ

সুভাষচন্দ্রের। সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা ক'রে আসছেন সে পলিটিকসের আসরে, আমি পূর্বেই বলেছি সেখানে আমি আনাড়ি। সেখানে দলাদলির ঝড়ে ধূলি উঠেছে, সেই ধূলিচক্রের মধ্যে আমি ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে—আমার দেখার শক্তি নেই। আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধ'রে আছে বাংলাকে। যে বাংলাকে আমরা বড়ো করব সেই বাংলাকেই বড়ো ক'রে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢ়সংকল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং সেই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাংলা দেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।"

জাতির চরম সংকটের দিনেও রবীন্দ্রনাথ কখনও অন্তরালে সরিয়া থাকিয়া গা ঢাকা দেন নাই। দেশবাসীর দুঃখ-কষ্টের অংশীদার হইতে তিনি কোনো দিনই পশ্চাৎপদ হইতেন না। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে হিজলী বন্দীশালায় সশস্ত্র পুলিশ রাজনীতিক বন্দীগণের উপর ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গুলী চালায়। বন্দী সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নিহত হইলেন। এই পৈশাচিক কাণ্ডে সমগ্র দেশে বেদনা ও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। দিন দশেক পরে ২৬-এ সেপটেম্বর কলিকাতায় গড়ের মাঠে শহীদযুগলের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রকাশার্থ এক জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে লক্ষাধিক নরনারীর সমাবেশ হয়। রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ শরীরে সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার অভিভাষণ পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :—

"প্রথমেই বলে রাখা ভালো আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে। কর্তৃপক্ষের কৃত কোন অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আনন্দ পাইনে। এই যে হিজলীর গুলী চালনা ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা কিছু আমার বলবার সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিক তাকিয়ে। এত বড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক; যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এলো সেই পীড়িতদের কাছ থেকে রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।

"যখন দেখা যায়, জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধরে নিতেই হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত লোকের পক্ষে এত সহজ অথচ যেখানে দুর্দম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া এত সহজ অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধা প্রাপ্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাঁদের 'পরে সেই সব শাসনকর্তার এবং তাঁদেরই আত্মীয়-কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং ভদ্র জাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

"এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশী রাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার

করে দিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি? এ কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আমি আজ উত্তেজনাবাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাই নে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এ কথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতঃই আপন কলঙ্কলাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যে উচ্চে ধরে আছে তত ঊর্ধ্বে আমাদের ধিক্কারবাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছতেই পারবে না। এ কথাও মনে রাখতে হবে আমার নিজের চিত্তে গম্ভীর শান্তি যেন রক্ষা করি, যাতে করে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথা চিন্তা করবার ধৈর্য আমাদের থাকে এবং আমাদের নির্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর দুঃখ স্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিন দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

"উপসংহারে শোকতপ্ত পরিবারদের নিকট আমাদের আন্তরিক সমবেদনা নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাই যে, এই মর্মভেদী দুর্যোগের একটা সম্পূর্ণ অবসান হলেও দেশবাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূলে পুণ্য শিখায় উজ্জ্বল দীপ্তি দান করবে।"

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাধারণ জনের ব্যথার ব্যথী। তিনি তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমাদের রাজনীতিক জীবনে নেতৃবর্গ কর্তৃক তাহারা যে উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, ইহাও তিনি দেখিয়াছেন। ইহাদের উন্নতির 'পরে যে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ভর করিতেছে, এই বিষয়েও তাঁহার সন্দেহ ছিল না। গ্রাম ও গ্রামবাসী সাধারণ জনের সমস্যা রবীন্দ্র-রচনাবলীতে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া

রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছেন নগরে এবং বাড়িয়া উঠিয়াছেন নগরের আবহাওয়ায়। কিন্তু তথাপি নগর তাঁহাকে মোহ-মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। পল্লী অঞ্চলকে তিনি বাছিয়া লইলেন তাঁহার কর্মক্ষেত্র-রূপে। পল্লীগ্রামের সাধারণ জন হইল তাঁহার সর্বক্ষণের সাথী, সহচর, সহযোগী ও সহকর্মী।

জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হইয়া রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁহার স্নেহাস্পদা শ্রীমতী রাণী চন্দকে কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন :—

"আজ যারা সাহিত্যের Proletariate সর্বহারা—এ সব বলে চেঁচাচ্ছে—তাদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়—কোন্‌খানে তোমরা কাজ করেছ। ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলা নয়, তোমরা তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছ? সাহিত্যে এ সব বলার মধ্যে গুণপণা থাকতে পারে। কিন্তু এটা সে ক্ষেত্র নয়। এখানে হাতে কলমে কাজ করতে হবে। আমাকে করতে হয়েছে এ কাজ। নিজের জমিদারীতে একদিন আমি তাদের মাঝখানে কাজ করেছি। আমি দূরে থাকিনি—থাকতে পারি নি। কারণ একটা পরিপূর্ণতাকে ভালবেসেছিলাম। এই দারিদ্র্য, বিচ্ছিন্নতা, মলিনতা দেখা যায় না। তা আমার কবিত্বকে আঘাত করেছিল। আমাকে নামতে হলো অবশেষে। আমার যা কিছু সম্বল ছিল, সব নিয়ে শেষ পর্যন্ত এখানে দাঁড়িয়েছি। যা আমার ছিল তা নিয়ে এর থেকে দূরে সরে থাকতে পারতুম সহরে, আরামে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে। তা না করে এই করেছি আমি। এটা অহংকার করে বলতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু যখন চারিদিক থেকে এরকম খিচিমিচি করে উঠে, তখন বলতে ইচ্ছা হয়—আমি করেছি এই কাজ। যদিও তা যৎসামান্য তবুও তো আমি করেছি। আমাকে Bourgeois বলে—আমি তো করেছি এই সব কাজ; কিন্তু যারা সর্বহারার নেতা, তারা কি করছে?"

কবি-গুরুর জীবন-সায়াহ্নে লিখিত কয়েকটি কবিতা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"এরা চির কাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল
এরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে পাকা ধান কাটে
এরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।"

* * * *

"চাষি ক্ষেতে চালাইছে হাল
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।"

* * * *

"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

বক্সা দুর্গে আবদ্ধ বাঙালী রাজবন্দীগণ রবীন্দ্রনাথের এক জন্মদিনে তাঁহাকে অভিনন্দন লিখিয়া পাঠাইলেন। গুরুদেব তাহা পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে 'রাজবন্দী বন্দনা' নামে একটা কবিতা লিখিয়া পাঠান। সেই অনবদ্য কবিতার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের মুক্তিসাধক রূপ উজ্জ্বল হইয়া প্রতিভাত হইয়াছে। কবিতাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"রাজবন্দী বন্দনা

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন
পিঞ্জরে বিহগ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কি অভিনন্দন॥
মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি' অঙ্কুর আকাশে দিল আনি'
স্ব-সমুত্থ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী॥
"অমৃতের পুত্র মোরা" কাহারা শুনালো বিশ্বময়?
আত্ম বিসর্জন করি' আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কেরে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়॥"